ভক্ত-চরিতামৃত।

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি-
গুরু শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীব-
গোস্বামীর জীবনচরিত।

প্রেম-ভক্তিতত্ত্বের সমালোচনা সম্বলিত

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং"
শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীঅধরচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৭নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, "মণিকা প্রেসে"
শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য ।৵০ দশ আনা।

উৎসর্গ।

পরম পূজ্যপাদ

স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায়

জ্যেষ্ঠতাত মহোদয়ের

শ্রীচরণ কমলে

এই গ্রন্থ

একান্ত ভক্তি সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।



সূচি-পত্র।

অবতরণিকা।

তান্ত্রিকদিগের রহস্যময় জুগুপ্সিত ভীষণ ব্যবহারে যখন বঙ্গদেশ শুষ্ক নীরসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, ন্যায় শাস্ত্রের বাদবিতণ্ডা, তান্ত্রিকাচারের পঞ্চ "ম"-কার ও প্রাণশূন্য আড়ম্বরময় বাহ্যক্রিয়া মাত্র যখন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত মরুময় বঙ্গদেশে হরিভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি-গদ‌-গদ দিব্যকান্তি সন্দর্শন করিয়া ও অমৃতায়মান ভক্তি-পরিপ্লুত উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া সংসারতাপে উত্তপ্ত শত শত ব্যক্তির প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। তিনি অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে প্রমত্তভাবে হরিগুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন মহাভাব-রসে মগ্ন হইতেন, তখন কেহই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিত না। চৈতন্যচন্দ্রের প্রেমভক্তির প্রবল তরঙ্গে শত শত ব্যক্তির মোহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সহস্র সহস্র জ্ঞানী মানী বিষয়ী লোক জ্ঞানের অভিমান মানের গৌরব ও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিতে উন্মত্ত হইয়াছে। পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র হইতে রাজ্যেশ্বর পাৎসা উজির সকলেই চৈতন্যচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। জাতি বর্ণ আচার বিচারের প্রাচীর ভেদ করিয়া পরাভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া তিনি হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিকট ভক্তিধন বিলাইতেন। কেবল বঙ্গদেশ নয়, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ

বারাণসী প্রয়াগ শ্রীবৃন্দাবন যেখানেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই প্রেমভক্তির বিপুল উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাষণ্ডীগণ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমা বৈরাগ্য ও হরিভক্তি সন্দর্শন করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন। রূপ সনাতন ও রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যবান ও ক্ষমতাবান লোকেরাও শ্রীচৈতন্যের সুবিমল মুখকান্তি সন্দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবিনিঃসৃত প্রাণপরিতৃপ্তিকর অমৃতস্যন্দী উপদেশ মালা শ্রবণ করিয়া সংসারের ধন জন মান সম্ভ্রম বিষবৎ পরিত্যাগ করত অতি দীনভাবে দিনপাত করিয়া কেবল হরিকথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে চৈতন্য দেবের অমানুষিক ঈশ্বরপ্রেম ও অনন্য-সাধারণ সংসারবৈরাগ্য দর্শন করিয়া যে সকল ঈশ্বরানুরাগী সাধুপুরুষ সংসারকে আবর্জ্জনাবৎ বর্জ্জন পূর্ব্বক তৎ প্রবর্ত্তিত ভক্তপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কঠোর বৈরাগ্য ও অহৈতুকী হরিভক্তির বিষয় চিন্তাকরিলে আমাদের সংসারাসক্ত নীরস চিত্তও চমকিত হইয়া উঠে।

চৈতন্যানুচরদিগের মধ্যে যে কতিপয় ব্যক্তি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ, শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাস, গোপালভট্ট ও রঘুনাথভট্ট, এইছয়জন গোস্বামীই বিশেষ বিখ্যাত। বৈষ্ণব সমাজে ইহাঁরা আদিগুরু বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জনের অর্থাৎ সনাতন, রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। সনাতন,

ও রূপ গোস্বামীর সহিত চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিতত্ত্বের অতি গভীর প্রসঙ্গ হইয়াছিল। পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ হইবে বিবেচনা করিয়া সেই সমুদয় ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে ও যথাসম্ভব সরলভাষায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সকল প্রেমভক্তিবিষয়ক আলোচনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমাদের নিজের কথা একটীও নাই। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের ব্যাখ্যাস্থলে স্বকপোল-কল্পিত মতের অনুসরণ করিয়া চলিলে প্রকৃত পক্ষে সেই সকল শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্‌ঘাটিত হয়না, এই কারণ বর্ত্তমান গ্রন্থে বৈষ্ণব শাস্ত্রের যথাযথ ভাব ও ভাষা রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। বিষয় গুলি অধিকতর সুবোধ্য করিবার অভি-প্রায়ে মধ্যে মধ্যে মূল পয়ার ও শাস্ত্রীয় শ্লোক এবং আবশ্যক-স্থলে টীকাও সংযোজিত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা গ্রন্থের শেষ-ভাগে পরিশিষ্ট আকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন পক্ষে মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত "চৈতন্য চরিতামৃত," বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত "চৈতন্য ভাগবত," কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক অনুবাদিত "ভক্তমাল গ্রন্থ" এবং "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" ও "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে বিশেষ রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলো-চনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের—বিশেষতঃ শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর বৈরাগ্যপূর্ণ স্বর্গীয় জীবনের মাধুর্য্যে অতি মাত্র আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের বিষয় বাঙ্গালি

পাঠক বর্গের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারিত করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম। কিছু দিন পরে কিয়দংশ লিখিয়া একান্ত ভক্তিভাজন রাজর্ষিতুল্যপূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দেখাই। তিনি তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হন, এবং আমাকে এইকার্য্যে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন। অনন্তর উক্ত মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে এই বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হই। এই পুস্তকের অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে ক্রমপ্রকাশ্যরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল প্রবন্ধ একত্র সঙ্কলিত আদ্যোপান্ত পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বাল্মীকি-রামায়ণের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক একান্ত ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় স্থলই দেখিয়া দিয়াছেন, এবং ইহার সংস্কৃতাংশের অনুবাদগুলিও তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম।
বোলপুর।
২৫ শে পৌষ, ১৩০০। — গ্রন্থকার

ভক্ত-চরিতামৃত।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী।

পূর্ব্ব-বিবরণ।

আমাদের দেশে অনেকেই রূপ সনাতনের নাম শুনিয়াছেন। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাঁদের বিষয় অবগত হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী গৌড় নগরে সৈয়দ হুসেন সা নামক একজন মুসলমান রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। * রূপ ও

* অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে আধুনিক মালদহ জেলার অন্তর্গত পদ্মাতীরে "গৌড়" নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। কেহ কেহ বলেন খ্রীষ্টাব্দের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজ-গৌড় নামা কোন নৃপতি এই নগর স্থাপন করেন। সেন বংশীয় হিন্দু রাজগণ ও বিজয়ী আফগান নরপতিগণের রাজত্বকালে এই নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন এই নগরকে সুসজ্জীভূত করিয়া স্বীয় নামে ইহার "লক্ষ্মণাবতী" নাম রাখিয়াছিলেন। যবনাধিকার কালে সৈয়দ হুসেন সাহা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নামা কোন উচ্চকুলোদ্ভব মুসলমান ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে এই নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমুদায় বঙ্গদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের কোন কোন অংশেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি একজন পরাক্রান্ত ও অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। হুসেন সা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই চক্রান্তকারী পুরাতন পাইকগণকে কর্ম্মচ্যুত করেন ও ঘোর অত্যাচারী কাফ্রিদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে

সনাতন উক্ত রাজার উজির অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। প্রচুর অর্থলোভেও ব্রাহ্মণসন্তানেরা তখন ম্লেচ্ছসংস্পর্শে আসিতেন না। যাঁহারা রাজকার্য্যে যবন সহবাসে থাকিতেন, হিন্দু সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয় হইতেন। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, সেই সময়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ এতদ্দেশীয় লোকদিগকে উপযুক্ততানুসারে সকলপ্রকার রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হওয়াকে যার পর নাই অধর্ম্মাচরণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ ইত্যাদি জাতিই রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া দেশ মধ্যে সম্ভ্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখনকার ন্যায় সে সময়ে যে ব্রাহ্মণজাতি আশ্রমাচার-

প্রদেশে দূরীভূত করিয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করিয়াছিলেন। এই সময়ে লোদী বংশীয়েরা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন।

এই বহুজনাকীর্ণ মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন নগর প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময়ে ইহার নামানুসারে সমগ্র বঙ্গবাসীগণ "গৌড়ীয়" নামে অভিহিত হইতেন। প্রায় এক শতজন রাজা দুই হাজার বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালের পরিবর্ত্তনে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরে মহামারী উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এই কারণে গৌড় একবারে জনশূন্য হইয়া যায়। পরে এই পরিত্যক্ত ও ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের মহামূল্য প্রস্তরাদি লইয়া গিয়া মুরসিদাবাদের সৌধ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক সময়ে যে স্থান শত শত রাজন্যবর্গের লীলানিকেতন ছিল, তাহা এখন নিবিড় অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদকুলের প্রমোদকাননে পরিণত হইয়াছে। গৌড়ের প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নচিহ্ন কিছু কিছু অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিভ্রষ্ট হইতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হয়েন নাই, তাহার প্রমাণস্থলে আমরা রূপ সনাতনের নাম উপন্যস্ত করিতে পারি। রূপ সনাতন কোন্ জাতীয় ছিলেন, ইহা লইয়া অনেকে বিবাদ করেন। কেহ বলেন, তাঁহারা মুসলমান ছিলেন এবং কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, তাঁহারা যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মুসলমান নবাবের দাসত্ব করাতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং কোন প্রকারে মুসলমান-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। রূপের দবিরখাশ ও সনাতনের সাকরমল্লিক এই দুই যাবনিক নাম বা উপাধি ছিল। "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে রূপ সনাতনের জন্ম-বিবরণাদির কোন উল্লেখ নাই। পিতামাতা তাঁহাদের কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহারা যে ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী অস্পৃশ্য পতিত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেন, ইহা ঐ গ্রন্থের নানা-স্থানে লিখিত আছে। "ভক্তিরত্নাকর" লেখক বলেন, রূপ সনাতনের পিতা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে পরম নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর তাঁহারা অর্থ লোভে যবনের দাসত্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে দুই ভ্রাতা আপনাদিগকে যবন অপেক্ষাও হীন ম্লেচ্ছ বলিয়া কখন কখন উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, বোধ হয় এই কার-ণেই অনেকে রূপ সনাতনের মুসলমানকুলে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে বিপ্রকুলোদ্ভব উচ্চবংশজাত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

"চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক," "ভক্তিরত্নাকর," "লঘুতোষণী" এবং "বৈষ্ণব তোষণী" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র অনিরুদ্ধকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। অনিরুদ্ধের দুই স্ত্রীর গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র হয়। রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় ও হরিহর শস্ত্র-বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, মাতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পৌরস্ত্যদেশে শিখরভূমির রাজার অধিকারে আসিয়া বাস করেন। সেই স্থানে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি জগন্নাথমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং যাগযজ্ঞ ধর্ম্মোৎসবাদিতে পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রগণের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমার। কুমার পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে, যদি তিনি কখন দৈবাৎ যবন দর্শন করিতেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সেদিন আর অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। ইনি অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কুমার জ্ঞাতিবর্গের অন্যায় ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়া নবহট্টের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের বাকলাচন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক

বাকরগঞ্জ) গিয়া বাস করেন। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ফতোয়াবাদ গ্রামেই রূপ সনাতন জন্মগ্রহণ করেন। কুমার দেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।* রূপ ও সনাতন বাল্যকালেই নানা বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর বিদ্যা-বাচস্পতির নিকটে সনাতন গোস্বামী যথানিয়মে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-তোষণী ও দশম টিপ্পনী গ্রন্থে সনাতন স্বীয় গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। রূপ সনাতনের বৈষয়িক বুদ্ধিও বিশেষ প্রখরা ছিল। গৌড়াধিপতি হুসেন সাহা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সনাতনকে সচিবের পদে ও রূপকে প্রধানতম রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইঁহারা রাজকার্য্যোপলক্ষে গৌড়-রাজধানীতে আসিয়া তৎ-সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই

---

* "শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ দেব ইন্দ্র সম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশ সর্ব্বোত্তম॥
মহীপতি পূজিত দেবজ্ঞ লক্ষ্মীবান।
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান॥
রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয়॥
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপেশ্বর।

স্থানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে বৈষ্ণবদিগের একটী প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে।

শস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর॥
বিভাগ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হইল পিতার॥
কত দিন পরেলোক সংঘট্ট করিয়া।
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হরিয়া॥
রাজ্য গেল রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বেযুক্ত আইলা পৌরস্ত্য দেশেতে॥
শ্রীশিখরেশ্বর সখ্যতাতে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই॥
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপাম॥
পদ্মনাভদেব সে শিখর ভূমি হইতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাসস্পৃহা চিতে॥
নবহট্ট গ্রামে বাস কৈলামহাশয়।
নৈহাটী নাম যার সর্ব্ব লোকে কয়॥
তথা পদ্মনাভ দেব মহাহর্ষ চিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে॥
করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল।
অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চ পুত্র জন্মাইল॥
শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ।
মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন॥
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ সর্ব্বোত্তম গুণবৃন্দ॥
শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ্ত পরম শুদ্ধাচার॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥
জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥

রূপ সনাতন কেবল সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন না, বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবৎভক্তিতেও পরম প্রবীণ ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্য্যের অবকাশ কালে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হরিকথাপ্রসঙ্গের নিমিত্ত পবিত্রচেতা সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গলাভ করিতেন। এই অবস্থায় ইহাঁরা "হংসদূত" ও "পদ্যাবলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এইরূপ প্রবাদ। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। রামকেলিতে স্বীয় বাসভবনের নিকটে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামে দুইটী কদম্বকানন-পরিশোভিত জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই আশ্রমনিকুঞ্জে দুই সহোদরে শ্রীহরির ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইতেন। ইহাঁদের কার্য্যকুশলতায় সন্তোষলাভ করিয়া গৌড়েশ্বর ইহাঁদিগকে স্বল্পকরে অনেক লাভবান জমিদারী দিয়াছিলেন। রূপসনাতন অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইয়াও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সময় যাপন করিতেন। অল্পদিনেই জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও দানশীল বলিয়া তাঁহাদের যশঃসৌরভ বিস্তৃত হওয়ায়, তাঁহাদের সভায় নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের জ্ঞানী, পণ্ডিত, নর্ত্তক, বাদক ও কবিগণের সমাগম হইত। তাঁহারা সকলকেই যথাযোগ্য

যশোরে ফতয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥
কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
রূপ সনাতন শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয়॥"

ভক্তিরত্নাকর।

দান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহারা কর্ণাট দেশ হইতে পূর্ব্বপুরুষ ও অন্যান্য জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে আনিয়া রামকেলিতে বাস করাইয়াছিলেন এবং জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্র ও সন্ন্যাসবৃত্তান্ত লোক-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া রূপ সনাতন তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভুর দর্শন লালসায় ব্যথিত হইয়া ও স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা প্রভুর নিকটে কএকবার দৈন্যপত্রীও প্রেরণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এই সকল পত্রের উত্তরস্বরূপ এই সংস্কৃত কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"

অর্থাৎ পরপুরুষে অনুরক্তা কুলস্ত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া যেমন মনে মনে রসবিশেষ আস্বাদন করে, তদ্রূপ বিষয়কর্ম্মে সংলিপ্ত থাকিয়াও ভগবানে চিত্ত মগ্ন রাখিবে। রূপ সনাতন এই ভাবেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের মিলন ও বৈরাগ্যোদয়।

কিছু দিন পরে যখন গৌরাঙ্গদেব নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করত কলনাদিনী ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী জনপদবাসিগণকে হরিভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে আপ্লুত করিয়া গৌড়নগরের সন্নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং নাম সংকীর্ত্তনের মধুর নিনাদে নগরবাসিগণকে চমকিত করিয়া তুলিলেন; তখন শ্রীচৈতন্যের মুখারবিন্দনিঃসৃত হরিনামসুধা পান করিবার জন্য এবং তাঁহার পবিত্র সহবাসসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবজনোচিত যৌবনশ্রীর সহিত সন্ন্যাসীবেশ—গৈরিক বস্ত্রাদির সমাবেশ হওয়াতে প্রতপ্ত কাঞ্চনকান্তির ন্যায় গৌরের অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতে লাগিলেন, লোক সকল আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তাঁহাতে অশ্রু, পুলক, স্বেদ কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিক মহাভাবের লক্ষণ দেদীপ্যমান দেখিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যাইতে লাগিল। গৌরাঙ্গের আগমনে গৌড়নগরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজে তার রামকেলি নাম॥

দিন পাঁচ সাত প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিল যেন কেহ নাহি জানে ॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোকে শুনিলেন চৈতন্য বিজয় ॥
সর্ব্বলোকে দেখিতে আইসে হর্ষমনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে ॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥
হুঙ্কার গর্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে ঘন ॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেক অন্যকর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোক শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া।
যদ্যপিও ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক।
তথাপিও প্রভু দেখি সভার সন্তোষ ॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করি।
সবে মিশি উচ্চকরি বলে হরি হরি ॥
শুনিমাত্র প্রভু হরিনাম লোকমুখে।
বিশেষ উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে ॥

* *

হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর রায়
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায় ॥

যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বলে হরি।
দুঃখশোক ঘর দ্বার সকল পাশরি॥

*   *

নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়॥
কখন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি নাহি শুনি॥
কহিলাম এই মহারাজ তোমাস্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ আগমনে॥"

চৈতন্য ভাগবত—অন্ত্যখণ্ড।

গৌড়াধিপতি নগরাধ্যক্ষের প্রমুখাৎ এই সমুদায় শ্রবণ করিয়া কেশব বসু নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ভীত হইয়া শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য গোপন করিয়া বলিল যে, একজন বৃক্ষতলবাসী

ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনের জন্য আসিয়াছে, দুই চারিজন লোক তাহাকে দেখিতে আইসে এইমাত্র। সহর কোতোয়াল মহারাজের নিকটে মিথ্যা গ্লানি করিয়াছে, হুজুর তাহার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কেশব বসু রাজাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া গোপনে একজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া চৈতন্যকে এইস্থান হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। তৎপরে রাজা একদিন দবিরখাশকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

"যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোঁসায়া।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপনমন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

যে দুর্দ্ধর্ষ যবনরাজ হুসেন সা উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এক সময়ে হিন্দু দেবমূর্ত্তিও দেউলাদি নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই হুসেন সা চৈতন্যের অলৌকিক মহিমা ও কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কোন প্রকার উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক,—গৌরচন্দ্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে গৌড়নগরে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে পারেন, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। রাজা বলিলেন, তোমরা

চৈতন্যকে গরিব সন্ন্যাসী বলিও না। এ ব্যক্তি নিশ্চয় দৈবশক্তিশালী মহাপুরুষ। দেখ, আমি দেশের রাজা, তথাপি বিনা বেতনে আমি এত লোককে কখনও একত্র করিতে পারি না। আর শত শত নর নারী আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া আনন্দিত মনে ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। আমি যদি ছয়মাস বেতন দিতে বিলম্ব করি, তাহা হইলে ভৃত্যগণ আমার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিবে। আর ইহাঁর আজ্ঞা সকল দেশের শত সহস্র লোকে কায়মনোবাক্যে পালন করিতেছে। ঘরের খাইয়া লোকে ইহাঁর সেবাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, আবার ভালরূপে সেবা করিতে না পাইয়া তাহাদের আক্ষেপই বা কত! ইনি স্বাধীনভাবে আপনার শাস্ত্রমত কার্য্য করুন, যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করুন,—কাজি কিম্বা কোতোয়াল কেহ যেন ইহাঁর হিংসা না করে। ইহা বলিয়া রাজা গৃহে গমন করিলেন। রূপসনাতন গৃহে আগমন করিয়া চৈতন্য-চরণ দর্শনের জন্য দুই ভ্রাতায় যুক্তি করিতে লাগিলেন, এবং নিস্তব্ধ নিশীথ কালে মন্ত্রীবেশ পরিত্যাগ করিয়া দুইজনে যাত্রা করিলেন। প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা দুই ভাইকে গৌরের নিকটে লইয়া গেলেন। রূপসনাতন গলবস্ত্র হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ করত করযোড়ে অতি দীনহীনের ন্যায় চৈতন্য-চরণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয়॥

নীচজাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কায।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥

* * * *

জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমাবিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়ের ভক্তিনিষ্ঠা ও বিনয়দৈন্য দেখিয়া চৈতন্য পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, তোমরা দৈন্য পরিত্যাগ কর, তোমরা আমার পুরাতন দাস। পূর্ব্বে আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের হৃদয় ও ব্যবহার জানিতে পারিয়াছি। কেবল তোমাদিগকে দেখিতেই আমি রামকেলি আসিয়াছি, নতুবা অন্য কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা যখন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাদের হীনতা অনুভব করিতেছ, তখন,

শ্রীহরি তোমাদিগকে সত্বরেই উদ্ধার করিবেন। তোমরা বিষয় ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমানস হও। আমি পশ্চাৎ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সবিশেষ বলিব। পরম বৈষ্ণব তোমরা দুইভাই ধন্য, কিন্তু আমাকে এরূপে স্তব-স্তুতি করিও না, আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয় ও আমার হৃদয়ে যেন কৃষ্ণভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। এই বলিয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া চৈতন্য বলিলেন, সকলে কৃপা করিয়া ইহাঁদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, ইহাঁরা উদ্ধার হউন। নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের চরণে রূপ সনাতন প্রণাম করিলেন। ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া নিস্তব্ধ নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। চৈতন্য বলিলেন, অদ্য হইতে ইহাঁদের রূপ ও সনাতন নাম হইল, যাবনিক নামে আর কেহ ইহাঁদিগকে ডাকিতে পারিবে না। রূপ সনাতন বিদায় হইবার সময় চৈতন্যকে বলিলেন, প্রভু, এইস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করুন। যদিও যবনরাজ আপনাকে এখন ভক্তি করিতেছে, কিন্তু যবন জাতিকে বিশ্বাস নাই। আর এত লোক সংঘট্ট লইয়া বৃন্দাবন গমন করাও ভাল নয়।

"আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রিযোগে গিয়া লইল চরণে শরণ॥
বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া।
আর্ত্তনাদ করে অতি বিষাদিত হইয়া॥

প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিব আমি কহিব বিশেষ॥
রূপ সনাতন নাম দুহাঁকারে দিয়া।
পুনঃ ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥”

ভক্তমাল গ্রন্থ।

“মহাপ্রভু তুষ্ট হৈয়া কহিল বচন॥
ধন্য তুমি দুই বড় পরম বৈষ্ণব।
কিন্তু আমা প্রতি না করিহ হেন স্তব॥
আমি জীব তোমরা আশীষ কর মোরে।
বৃন্দাবন দেখি যেন কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে॥
যদ্যপি সর্ব্বজ্ঞ তভু জিজ্ঞাসিলা তাঁরে।
কি নাম দোঁহার কহ আমার গোচরে॥
সাকর মল্লিক নাম সনাতনের ছিল।
রূপ সাকর মল্লিক অভিধা জানাইল॥
প্রভু কহে তুমি হও অতি মহজ্জন।
তোমার এমত নাম না হয় শোভন॥
ত্রিকালজ্ঞ প্রভু জানে সর্ব্বসমাচার।
সনাতন বলি নাম রাখিল তাঁহার॥”

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, নবম অঙ্ক।

রূপ সনাতন গৌরচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। পৃথিবীর ধনজন সম্ভ্রম-সম্পত্তি সুখ-সৌভাগ্য সমস্তই অসার, বিষয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া

নিশ্চিন্ত মানস হইয়া হরিচরণাশ্রয় করাই কেবল মানব জীবনের সার্থকতা ও শান্তিলাভের হেতু, এই ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইল; বৈরাগ্যের তীব্র অনল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রূপ সনাতন দরিদ্র ছিলেন না। বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মানসম্ভ্রম অর্থ বিত্তে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের নিম্নেই পরিগণিত হইতেন। কিন্তু "ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ" অর্থ বিত্তেতে মানবাত্মার তৃপ্তি নাই। মনুষ্য শতবর্ষজীবী পুত্র পৌত্র লাভ করুক, হস্তী হিরণ্য অশ্বাদির অধিপতি হউক অথবা মহদায়তন ভূমির অধিকারী হউক, তাহার অন্তরাত্মা কিছুতেই যথার্থ তৃপ্তি ও আরাম লাভ করিতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" ক্ষুদ্র বিষয় রাজ্যে সুখ নাই, ভূমা পরমেশ্বরেতেই মানবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি। মানবের অন্তরে যে মুহূর্ত্তে অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাব প্রস্ফুটিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ হ্রাস হইয়া যায়। যথার্থ বৈরাগ্যের লক্ষণ এই যে প্রাণ মন যতই ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইবে, তদিতর পদার্থের প্রতি ততই বিরাগ উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়কামনা ও বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের বিক্ষিপ্তি অপরিহার্য্য। বিক্ষিপ্ত চিত্তে পরমাত্মার শ্রবণ মনন অসম্ভব। এই জন্য ভক্ত সাধক ও যোগার্থীরা বিষয়কামনা পরিহার করিয়া নিশ্চিন্তমানস হইবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। সংসারের সহিত সমুদায় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা বিষয়কামনা

ত্যাগের অর্থ নহে। বিষয়ের প্রতি পূর্ণ আসক্তি পরিত্যাগ করাই তাহার তাৎপর্য্য। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বোধে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহারা বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত না হইয়া শান্তিসম্ভোগ করেন। ফলতঃ সুমিষ্ট সুপক্ক সুরসাল ফল ভক্ষণ করিলে যেমন আর নিম্বফলের প্রতি আস্থা থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা জীবনে একবারও ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কুটিল সংসারের সেবা করিতে পারেন না। সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ, শ্রীচৈতন্যের পবিত্র সহবাস ও ভক্তিবিগলিত মধুর উপদেশ, এবং দেবপ্রসাদে রূপ সনাতনের চিত্তভূমিতে প্রেমভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় হরিচরণারবিন্দ তাঁহাদের এখন একমাত্র আশ্রয়। বৈরাগ্যের কি অমোঘ প্রভাব! এই বৈরাগ্যের প্রভাবেই কপিলবস্তুর রাজকুমার ইন্দ্রের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রমোদ-কানন, জীবনতোষিণী পতিপ্রাণা প্রণয়িনী ও সুকুমার শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাইচন্দ্র বৈরাগ্যের তেজে উদ্দীপ্ত হইয়াই শচীমাতার স্বর্গীয় স্নেহের বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, এবং নিরপরাধা বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু-সিক্ত বিষণ্ণ মূর্ত্তিকেও উপেক্ষা করিয়াছেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রূপ সনাতন বিষয়বন্ধন মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ও যাহাতে অচিরে বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যচরণাশ্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সৎব্রাহ্মণের দ্বারা পুরশ্চরণ

করাইলেন। নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পরিবারগণকে চন্দ্রদ্বীপ ও ফতোয়াবাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ রূপ গোস্বামী কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া গোপনে নৌকারোহণে ধনসম্পত্তি লইয়া বাটীতে আসিলেন, ও বিত্তবিভব ধনরত্ন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্বগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। * আবশ্যক হইলে সনাতন ব্যয় করিতে পারিবেন বলিয়া গৌড়ের কোন বণিকের নিকটে রূপ দশহাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এ যাত্রায় গৌরাঙ্গের বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। বহু লোক সমারোহে আড়ম্বর করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করা অবৈধ জ্ঞানে তিনি রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানাইনাট্যশালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার নীলাদ্রি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং নীলাদ্রি হইতে

* এ সম্বন্ধে এদেশে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর একদিন রাত্রিকালে রূপ রাজকার্য্যের অনুরোধে নবাব কর্ত্তৃক আহূত হন। রাত্রি দ্বিপ্রহর, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতেছে, রজনী গাঢ়অন্ধকারে ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে, এমন সময়ে রূপ গোস্বামী রাজপ্রাসাদ অভিমুখে অতিকষ্টে পদব্রজে চলিতেছেন। পথিপার্শ্বে এক মেথরের কুটীর ছিল। রূপের পদশব্দ শুনিয়া মেথর-গৃহিণী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে কে ঘরের বাহির হইয়াছে?" মেথর বলিল, "বোধ হয় কুকুর যাইতেছে।" মেথরপত্নী বলিল, "এরাত্রে কুকুরও গৃহের বাহির হয় না, নিশ্চয় কোন ধনী লোকের চাকর যাইতেছে।" এই কথা রূপ শুনিতে পাইলেন। মেথরাণীর বাক্যে স্বীয় জীবনের প্রতি রূপের ঘৃণা উপস্থিত হয়। অর্থের লোভে সামান্য পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, এইচিন্তা রূপের হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উৎপাদন করে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহসংসার পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করেন।

শৈলকন্দরলতাকুঞ্জবেষ্টিত বনপথে বৃন্দাবন গমন করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীরূপ এই সংবাদ অবগত হইয়া গৌরের উদ্দেশে পুরুষোত্তমে দুইজন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা গৌরচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন-বার্ত্তা প্রেরণ করিলে শ্রীরূপ এই সংবাদ সনাতনকে লিখিয়া পাঠাইলেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে সঙ্গে লইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ত্রিধারাধারিণী ত্রিবেণীসঙ্গম প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বল্লভের আর এক নাম অনুপম। "ষট্ সন্দর্ভ" প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র-প্রণেতা ভক্তিমান পণ্ডিতপ্রবর জীব গোস্বামী ইহাঁরই সন্তান।

তৃতীয় অধ্যায়।

সনাতনের রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ ও কারাবাস।

সনাতন এখনও রাজকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন; এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয়-বন্ধন উন্মোচিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল প্রধূমিত হইতেছিল, মন সদাই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। সনাতন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই রাজানুগ্রহই আমার বিষম বন্ধন। রাজা যদি কোনরূপে আমার প্রতি বিরক্ত হ'ন, তাহা হইলে আমি এই যন্ত্রণাজাল হইতে অব্যাহতি পাই।

"এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনেমন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

সনাতন মনে করিলেন, অসুস্থতার ভান করিয়া যদি রাজকার্য্যে অনুপস্থিত থাকি, তাহা হইলে রাজা বিরক্ত হইবেন, এবং রাজা বিরক্ত হইলেই আমার নিষ্কৃতি। সনাতন রাজদরবারে না গিয়া গৃহে রহিলেন, এবং নির্জ্জনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ অবগত হইয়া রাজা চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া গিয়া বলিল, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। একদিন সনাতন পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করিতেছেন, অকস্মাৎ গৌড়েশ্বর স্বয়ং এক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই সভামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজাকে বসিতে আসন দিলেন। গৌড়রাজ সনাতনকে বলিলেন, রাজবৈদ্য বলিয়াছেন তোমার কোন ব্যাধি নাই, অথচ তুমি রাজদরবারে গমন কর না, তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? তোমাকে লইয়াই আমার সকল মন্ত্রণা, তোমা ব্যতীত রাজকর্ম্ম অচল হইয়াছে, তুমি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়। তোমার মনের কথা খুলিয়া বল। সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন, আমার দ্বারা আর রাজকর্ম্ম

হইয়া উঠিবে না, আপনি অন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করুন। সনাতনের কথা শুনিয়া রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এক ভাই চাক্‌লা সব ফেরার করিয়া ফেলিয়াছে, জীবপশু মারিয়া দস্যুর ন্যায় সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইয়া গেল, আর তুমি কাজ কামাই করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ। রাজা রূপকে ডাকাত বলায় সনাতন অন্তরে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, আপনি স্বাধীন রাজা, অপরাধীকে আপনি ইচ্ছামত শাস্তি দিতে পারেন। এই কথায় রাজা আরও বিরক্ত হইলেন এবং সনাতন পলাইতে না পারেন, এ জন্য তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়া গৃহে গমন করিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যাধিপতির সহিত সীমান্তপ্রদেশ লইয়া হুসেন সাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিচক্ষণ মন্ত্রী সনাতনকে সঙ্গে লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করেন, রাজার ইহা একান্ত ইচ্ছা। সনাতনকে কারাগার হইতে আনাইয়া রাজা এই বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, সনাতন উত্তর করিলেন, হুজুর! আপনি দেবতা ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে যাইবেন, আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই। ইহা শুনিয়া পাৎসা ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। পরে সনাতনকে কারাগারে বান্ধিয়া রাখিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে সংগ্রামক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা সনাতনের কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতাতে অতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। কেবল রাজকীয় কার্য্যানুরোধে কারাগারে বন্দী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"শ্রীসনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে সদা রাখিল নয়ন॥

*   *   *

রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা।
তুমিহ তাঁহাই বুঝি করিবা ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হইতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তথ্য বুঝিয়া সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিয়া কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ।

"অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব হৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥

* * *

এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥”

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীরূপের প্রয়াগ গমন ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা।

রূপ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিক অতিকষ্টে প্রয়াগতীর্থে উপনীত হইয়া দেখিলেন গৌরচন্দ্র ত্রিবেণী-স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দেবদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, শত শত লোক তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রেমাবেশে হরিধ্বনি করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী প্রেমে বিগলিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দান করাতে প্রেম ভক্তির মহাভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছে। প্রমত্ত ভক্তগণের নামকোলাহল, গভীর হরিধ্বনি ও প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড বন্যাতে যেন প্রয়াগ নগর ডুবিয়া যাইতেছে।

“কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥”

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড। ১৯শ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত বিপুল জনস্রোতে রূপ ও অনুপম কোথায় ভাসিয়া গেলেন। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নৃত্যকীর্ত্তন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণপরে কীর্ত্তন কোলাহল থামিয়া গেল। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশীয় এক বিপ্র গৌরচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। চৈতন্যচন্দ্র উক্তবিপ্রগৃহে নির্জ্জনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া দীনহীন অকিঞ্চন বেশে শ্রীরূপ ও বল্লভ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দরের প্রেমরঞ্জিত রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা প্রেমে পুলকিত হইয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

"বিপ্রগৃহে প্রভু আসি নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছতৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড। ১৯শ পরিচ্ছেদ।

বিষয়পাশমুক্ত ব্যাকুলহৃদয় বৈরাগী শ্রীরূপকে দর্শন করিয়া চৈতন্যের মন প্রসন্ন হইল; আইস আইস বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"*

*অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন, চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হওয়া যায় না, অতি নীচ জাতীয় চণ্ডালও ভক্তিতে আমার প্রিয় হয়। এরূপ ভক্তকেই দান করিবে ও তাঁহার দান গ্রহণ করিবে; তিনি আমার ন্যায় পূজ্য।

এই শ্লোক পাঠ করিয়া দুই ভাইকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

"প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥
শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হইল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয় কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুইজন ॥
প্রভু কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য রূপ ও বল্লভকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ বলিলেন, তিনি রাজদ্বারে বন্দীদশায় রহিয়াছেন, আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই তিনি উদ্ধার হইবেন। চৈতন্য বলিলেন সনাতন কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, অচিরাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগেই রহিলেন। প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া ভক্তগোষ্ঠীতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগের অদূরে যমুনার পর পারে আম্বুলী গ্রাম। তৎকালে সেখানে বল্লভভট্ট নামে একজন জ্ঞানী ও ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। চৈতন্য, রূপ ও অনুপমের সঙ্গে বল্লভভট্টের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা ভট্টাচার্য্যকে দূর হইতে

প্রণাম করিলেন। ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে "আমরা অস্পৃশ্য পামর আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না" এই বলিয়া রূপ ও অনুপম দূরে সরিয়া পড়িলেন। এই ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ইহাঁদের দৈন্য বিনয় দেখিয়া চৈতন্য হর্ষে পুলকিত হইয়া ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, তুমি একজন প্রবীণ কুলীন এবং বৈদিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, তুমি ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিও না, ইহাঁরা অতি হীন জাতি। চৈতন্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ভট্ট বলিলেন, ইঁহাদের মুখে যখন নিরন্তর হরিনাম নৃত্য করিতেছে, তখন ইহাঁরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।* ইহা শুনিয়া চৈতন্য ভট্টকে বহু প্রশংসা করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন, শুদ্ধভক্তিরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে যাহার নীচজাতিজনিত পাপ সকল দগ্ধ হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, এপ্রকার চণ্ডালকেও পণ্ডিতেরা সম্মান করেন। কিন্তু হরিভক্তিহীন নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও তাঁহাদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় না। প্রাণবিহীন পুত্তলিকাকে লোক-রঞ্জনের জন্য বহুমূল্য বশনভূষণে সুসজ্জিত করা যেমন বিড়-

---

*"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"
ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন; তাঁহারাই প্রকৃত তপস্যা করেন, হোম করেন, তীর্থে স্নান করেন, বেদাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহারাই আর্য্য অর্থাৎ সদাচার-নিরত।

স্বনা মাত্র, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ, পুরশ্চরণাদি সকলই বৃথা।

আম্বুলী গ্রামের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা যমুনা প্রবাহিতা। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিরন্তর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং কল্লোলিত-কালিন্দীর সুস্নিগ্ধ-শ্যামল-বারিধারা সন্দর্শন করিয়া চৈতন্য প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রেমোন্মত্ত নিমাইচন্দ্রের অদ্ভুত ভক্তিভাবের কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে দর্শকগণ আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আপনাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিলে প্রেমভরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কখন্ বা মধ্য যমুনাতে পড়িয়া যান, এই ভয়ে, ভট্ট, তাঁহাকে প্রয়াগে রাখিয়া আসিলেন। প্রয়াগে অবস্থানকালে চৈতন্য রূপ গোস্বামীর জীবনে শক্তি-সঞ্চার* করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব,

*ইচ্ছাশক্তি(Willforce) প্রভাবে নিজের মানসিক ভাব অন্যের মনে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহা বর্ত্তমান সময়ের অনেক মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত স্বীকার করেন। Mesmerism বা Hypnotism অর্থাৎ মোহনবিদ্যার আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মানবের হৃদয়ে যে ভাব খুব প্রবল হয়, মানুষ সেই ভাবের দ্বারা অন্যকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়, ইহা প্রমাণিত সত্য। সচরাচর দেখা যায় বীরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত শত যোদ্ধাকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ঘোর দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের নীচভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও অনেককে নীরয়গামী হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ সকল বিষয়েই সবল ব্যক্তিরা তদপেক্ষা দুর্ব্বলকে তাহাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মারা কোটি কোটি মানবকে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া জগতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সাধু মহাত্মারা যে, আপনাদিগের আধ্যাত্মিক বীর্য্য শ্রদ্ধাবান শিষ্যের হৃদয়ে

ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় ভাগবতসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি রায় রামানন্দের নিকট যে সকল প্রেমভক্তির গূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে সে সমুদায় শিক্ষাদিলেন। কবিকর্ণপূর স্বপ্রণীত "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" চৈতন্যের সহিত রূপগোস্বামীর মিলন বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"লোক ভিড় তরে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপগোস্বাঞীকে শিক্ষা করান্ শক্তিসঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। গৌর বলিলেন, রূপ! তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তিরসের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিন্ধু পারাবারশূন্য অনন্ত গম্ভীর, তোমাকে তার বিন্দুমাত্র কহিতেছি। কেশাগ্র শতভাগ করিয়া পুনঃ শত ভাগ করিলে যাহা হয়, জীবের স্বরূপ তদপেক্ষাও সূক্ষ্মরূপে কল্পনা

সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বোধ হয় বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ ইহাকেই "শক্তিসঞ্চার" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

করা যায়। জীব পূর্ণ চিৎ-স্বরূপ ঈশ্বরের অত্যল্প কণামাত্র। ঈশ্বর নিয়ন্তা জীব নিয়মিত, তিনি শাসনকর্ত্তা, জীব শাসনাধীন। অনেকে অনন্তস্বরূপ নিত্যচৈতন্যরূপী সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর হইতে জীব অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা মিথ্যা কল্পনামাত্র। জীব শরীরধারী, জন্মমরণধর্ম্মশীল বিকারী, তাহা কিরূপে আপনি আপনার নিয়ামক হইবে? অপূর্ণতাই জীবের স্বভাব, আর পরমেশ্বর অনাদ্যনন্ত "মহান প্রভুর্ব্বৈপুরুষঃ"। জীব ও ঈশ্বর সমান, যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপ কিছুমাত্র জানেন না। তাঁহাদের এই মত অতি দূষণীয়। জলস্থলময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসৃষ্টিকে পূর্ণ চিৎস্বরূপের অতিক্ষুদ্রতম অংশ বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে স্থাবর বাদ দিলে জঙ্গমকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। তির্য্যক অর্থাৎ কীট পতঙ্গ পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণী, জলচর ও স্থলচর জীবজন্তু। স্থলচরের মধ্যে মনুষ্য অতি অল্প। মনুষ্যের মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর অধিকাংশ। অতি অল্প লোকই বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক কেবল মৌখিক। ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া বেদনিষিদ্ধ পাপকর্ম্মে তাহারা রত রহিয়াছে। ধর্ম্মাচারী লোকদিগের মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠ লোক অধিকতর, অন্তঃসারশূন্য বাহ্য-অনুষ্ঠান লইয়াই তাহারা বিব্রত। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একজন জ্ঞানী। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন জীবন্মুক্ত, কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন হরিভক্ত সাধু অতি দুর্লভ। হরিভক্তেরা কামনাশূন্য এইজন্য শান্ত, ভক্তিতেই যথার্থ শান্তি।

মুক্ত, সিদ্ধ ও ফলকামীরা অশান্ত। ভাগবতে কথিত হইয়াছে,

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কন্ধ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব! যে সকল ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোটির মধ্যে বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতীব দুর্ল্লভ।

"প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তি রসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার নাযায় বর্ণন॥
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরস সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারী॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে॥
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত॥”

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

হে শ্রীরূপ! ভগবানের কৃপাতে ভাগ্যবান্ মানব ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন। নিয়ত শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলে উক্ত বীজ সেচন করিলে তাহা হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সেই লতা গোলোক বৃন্দাবন ধামে হরিচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে, এবং তাহা হইতে প্রেমফল প্রসূত হয়। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তকোত্তোলন করে, তাহা হইলে ভক্তিলতা উৎপাটিত ও ছিন্ন হইয়া যায়। ভক্তিলতার সঙ্গে যদি ভোগবাসনা, স্বর্গকামনা, মুক্তিবাঞ্ছা, লাভ প্রতিষ্ঠা, জীবহিংসা ও নিষিদ্ধাচার প্রভৃতি উপশাখা মিলিত হয়, তাহা হইলে সেকজল পাইয়া উপশাখাগণই বর্দ্ধিত হয়, মূলশাখা অর্থাৎ ভক্তিলতা আর বাড়িতে পায় না। এই জন্য প্রথমেই উপশাখা ছেদন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ হরিভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভুক্তি অর্থাৎ ভোগলালসা, মুক্তি ও স্বর্গভোগ প্রভৃতি সমুদায় ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল হরিচরণাশ্রয় না করিলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সকল প্রকার সাধন ভজন বৃথা হইয়া যায়। এই ভক্তিলতা অবলম্বন করিয়া সাধক কল্পবৃক্ষ লাভ করেন এবং পরম সুখে সুপক্ক প্রেমফলরস আস্বাদন করেন। এই ভগবৎপ্রেমরসাস্বাদনই পরম

ফল—পরম পুরুষার্থ। ইহার নিকট চারি পুরুষার্থ তৃণ তুল্য*। শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ কর। অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, শুষ্কজ্ঞানকর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের আনুকূল্যে হরিপ্রেমরসানুশীলন করাই শুদ্ধ ভক্তি, ইহাকেই অহৈতুকী ভক্তি বলাযায়। পিশাচীতুল্যা ভোগবাসনা ও মুক্তিস্পৃহা হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে বহু সাধনাতেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে,

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত" অর্থাৎ অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাগ্রচিত্তে পবিত্র ভাবে ইন্দ্রিয়াদির আনুকূল্যে ভগবদনুশীলন করার নামই ভক্তি। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

---

* সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত একলোকে বাস; সার্ষ্টি কি না আমার ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি; সামীপ্য অর্থাৎ আমার নিকটে থাকা; সারূপ্য, আমার তুল্য রূপ পাওয়া; একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, আমার সহিত অভিন্ন হওয়া; এই পাঁচ প্রকার মুক্তি আমার ভক্তকে দিতে চাহিলেও আমার সেবা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবদিগের মতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অতীত ভগবানে বিশুদ্ধ সেবাময় প্রেমই মোক্ষের চরমদশা রূপ অপবর্গ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহার নাম পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত "চৈতন্য চরিতামৃত" ১২৪পৃষ্ঠা দেখ।)

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥" ৩য় স্কন্ধ।

সাগরাভিগামিনী গঙ্গাধারার ন্যায় যে মনোগতি, আমার গুণ শ্রবণ মাত্র, ফলানুসন্ধান নাকরিয়া ও ভেদদর্শন বর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বান্তর্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়, সেই মনোগতিরূপ ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাই অহৈতুকী ও অব্যব হিত ভক্তি।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পর ব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল, পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯শ পরিচ্ছেদ।

ইক্ষুরস যেমন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গুড় খণ্ড সার

শর্করা মিছরি ও উত্তম মিছ্রি প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেমের ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদায় ভক্তিরসের স্থায়ীভাব, ইহার সহিত বিভাব অনুভাব অর্থাৎ উদ্দীপনা ও মনের পূর্ণ একাগ্রতা মিলিত হইলে ভক্তিরস অমৃত মধুর হইয়া থাকে। ভক্তের প্রকৃতিভেদে রতিভেদ পাঁচ প্রকার। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পাঁচ প্রকার রতিভেদে হরিভক্তিরস পাঁচ প্রকার হয়। ভক্তিরস মধ্যে এই পাঁচটিই প্রধান।* হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক এবং বীভৎস এই সাতটি গৌণ রস। যে ব্যক্তি যে রসের ভক্ত, তাহার হৃদয়ে সেই প্রধান রস স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করে। সাধন ভজনে অগ্রসর হইলে গৌণ রসেরও সঞ্চার হয়।

পুনশ্চ, ভক্তি দ্বিবিধ। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-মিশ্রা আর কেবলা। কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবল রাগময়ী। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে শান্ত দাস্য রস উদ্দীপিত হয়, কিন্তু বাৎসল্য সখ্য ও মাধুর্য্যরস সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, বাৎসল্য রসে, শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীর চরণবন্দনা করিলে, তাঁহারা পুত্রকে ঈশ্বরবোধে শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই। সখ্য রসে, কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্য প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। ভীত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ

*পরিশিষ্ট দেখ।

তোমাকে যে সখা, যাদব ইত্যাদি তিরস্কারসূচক সম্বোধন করিয়াছি, তুমি সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর। মধুর রসে কৃষ্ণ কৌতুকচ্ছলে রুক্মিণী দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন বলিলে, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া রুক্মিণী সন্ত্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলা প্রীতিতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না। নন্দ যশোদা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়া সামান্য আত্মজ জ্ঞান করিয়া বাৎসল্যভাবে লালন পালন করিতেন। শ্রীদামাদি রাখাল বালকগণ সখ্যভাবে কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন. ব্রজাঙ্গনাগণ প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ভাবে অসঙ্কোচে প্রীতি করিতেন।

পরমেশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজগণ-রাজা সর্ব্বশক্তি-মান মহান্ প্রভু, এই ভাব শান্ত দাস্য রসের প্রাণ। ইহা ভয় ও সম্ভ্রম মূলক, কিন্তু প্রেম মূলক নহে। ইহাকেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা বলা যায়। বাৎসল্য সখ্য মধুর রসে এ প্রকার ভয় সম্ভ্রম প্রভুত্ব প্রভৃতি সঙ্কুচিত ভাব নাই। তাহা কেবল বিশুদ্ধ প্রীতিতে আত্মসমর্পণের ব্যাপার; এই জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার নাম কেবলা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি সম্পর্ক শূন্য কেবল অনুরাগময়ী। কেবলা রতিতেও দাস্যভাব আছে, কিন্তু তাহা ঐশ্বর্য্যজনিত নহে। পুত্রকে পিতা মাতা যেমন স্নেহের সেবা করেন ও স্ত্রী যেমন দাসীর ন্যায় স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন, ইহা তদ্রূপ প্রেমজনিত সেবা।

অতঃপর চৈতন্য পঞ্চবিধরসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগি-লেন,—ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া তাঁহাতে একাগ্র নিষ্ঠা হওয়াই শান্তরস। ভাগবতে ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন,

আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠাই শম। * ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি একমাত্র পরমেশ্বরকেই প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহার আসক্তি থাকে না। স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভকেও তিনি নরকের ন্যায় জ্ঞান করেন। শান্ত রসের দুই গুণ—পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠা ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন সকল ভৌতিক বস্তুতেই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শান্তরসের গুণদ্বয় সর্ব্বপ্রকার ভক্তের জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শান্তরসে ঈশ্বরের সত্তা মাত্রের জ্ঞান হয়, সুতরাং শান্তরসই ভক্তির পত্তনভূমি। গাঢ় প্রেমের মত্ততা শান্ত রসে হয় না। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সেবা সম্ভ্রম গৌরব, ইহা দাস্য রস। সখ্য রসে বিশ্বাস, বাৎসল্য রসে মমতা, মধুর রস কান্তভাবে অসঙ্কোচ সেবা, মমতাধিক্য ও আত্মসমর্পণ। এই সকল ভাব ক্রমান্বয়ে পরপর রসে অনুভূত হয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই ভৌতিক গুণ সকল যেমন ক্রমান্বয়ে পরস্পর মিলনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একাধারে ক্ষিতিতে মিলিত হইয়াছে; সেই প্রকার শান্তরসের গুণদ্বয় দাস্য রসে, দাস্যরসের গুণ সখ্যরসে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ কান্তভাবে একাধারে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহা মাধুর্য্যরস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্যরসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় ইহা আশ্চর্য্য অমৃতাস্বাদযুক্ত।* হে শ্রীরূপ!

---

* "শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখ সংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥" ভাগবত—১১ স্কন্ধ।

আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। এবং জিহ্বা ও উপস্থ বশীকরণের নাম ধৈর্য্য।

* বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দেখ।

ভক্তিরসের পথ মাত্র আমি প্রদর্শন করিলাম। ভক্তিরস-সমুদ্রের অনন্ত বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য্য তুমি এখন আলোচনা কর।

এইরূপে প্রেমভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে করিতে চৈতন্য-চন্দ্র প্রেমরসে পরিপ্লাবিত হইয়া রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন, রূপ! ভগবানের কৃপাই মূল, তাঁহার কৃপা হইলে সামান্য মূর্খেরাও ভক্তিসমুদ্র উত্তরণ করিতে পারে।

"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হইল মন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া গৌরাঙ্গ বারাণসী গমন করিতে উদ্যত হইলে, রূপ বলিলেন, অনুমতি করেন ত আমিও আপনার সঙ্গী হই। আপনার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না। গৌর বলিলেন, বৃন্দাবনের এত নিকটে যখন আসিয়াছ, তখন বৃন্দাবন ধাম দর্শনার্থ যাত্রা কর। তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাদ্রিতে আমার সহিত মিলিত হইও। চৈতন্যের আদেশে শ্রীরূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সনাতনের কারামুক্তি ও কাশীধামে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন।

প্রধান রাজমন্ত্রী ঈশ্বরপ্রেমিক সনাতন গৌড় রাজধানীতে বন্দীশালায় অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। "এই অবস্থায় শ্রীরূপের পত্র আসিয়া পৌছিল। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, আমরা দুই ভাই চৈতন্যচরণ দর্শনের জন্য চলিলাম, তুমি যেরূপে পার ছুটিয়া আইস। মুদীগৃহে দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছি, আবশ্যক হইলে তাহা দিয়া কোন প্রকারে কারা-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চলিয়া আসিও। এই পত্র পাইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কারাধ্যক্ষকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, মিঞা সাহেব! কেঁতাব কোরাণ শাস্ত্রে আপনি মহা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। শাস্ত্রে আছে, নিজ ধন দিয়া একজন বন্দীর কারামোচন করিতে পারিলেও পরমেশ্বর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমি এতদিন আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আপনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করুন। আমি আপনাকে পাঁচ সহস্র টাকা দিতেছি। ইহাতে আপনার পুণ্যসঞ্চয় ও অর্থলাভ দুইই সিদ্ধ হইবে। আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে ভগবান আপনার সকল বিপদ দূর করিবেন। কারাধ্যক্ষ যবন বলিলেন, মহাশয়, আপনাকে

ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু রাজাকে বড় ভয় হয়। সনাতন উত্তর করিলেন, রাজা দক্ষিণদেশে যুদ্ধে গিয়াছেন, না আসিতেও পারেন; যদি ফিরিয়া আসেন, বলিবেন যে সনাতন গঙ্গার নিকটে বহির্দ্দেশে গিয়া শৃঙ্খল সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আপনার কোন ভয় নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব। * সনাতনের অনুনয় বাক্যে সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে সনাতন সাত হাজার টাকা তাহার সম্মুখে রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ এবারে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলেন এবং রাত্রিকালে গোপনে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। সনাতন কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঈশান নামক একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিলেন। গ্রাম নগরের প্রকাশ্য রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্যবনপথে ফল মূল জল মাত্র দ্বারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া অতি ক্লেশে পাতরা পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই পর্ব্বতে একজন দস্যু ভৌমিক (ভুঁঞা) কুটুম্বপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত। পথিক লোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া প্রাণ বিনাশ করাই তাহার ব্যবসায়। সনাতন উক্ত

---

* সনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি যে শুদ্ধ মুসলমান কারাধ্যক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ভুঁঞার নিকট উপস্থিত হইয়া, পর্ব্বত পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ভুঁঞার নিকটে একজন গণক ছিল, সে মাটীতে অঙ্কপাত করিয়া হাত গণিয়া কাহার নিকটে কি আছে বলিতে পারিত। সেই গণক কাণে কাণে ভুঁঞাকে কহিল যে সনাতনের কাছে আটটী সোণার মোহর আছে। ইহা শুনিয়া ভুঁঞা আনন্দিত হইয়া অতি সমাদরে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী রাজমন্ত্রী সনাতন, অপরিচিত ভৌমিকের এবম্বিধ সমাদরের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ঈশানকে, তাহার নিকটে টাকাকড়ি কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান লোভবশতঃ একটী মোহর গোপন করিয়া বলিল তাহার নিকটে সাতটী মোহর আছে। সনাতন ঈশানকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, এই কালযম কেন সঙ্গে আনিয়াছ? সনাতন তখন সাতটী মোহর ভুঁঞার হস্তে অর্পণ করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, আমার কাছে এই সাতটী মোহর ছিল, ইহা লইয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য সড়কে আমি যাইতে পারি না। আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে তোমার পুণ্য লাভ হইবে। ভুঁঞা হাসিয়া বলিল, তোমার ভৃত্যের কাছে আটটী মোহর আছে, আমি তাহা প্রথমেই জানিতে পারিয়াছি। তুমি অতি সুবুদ্ধি, এই মোহরের জন্য আজ রাত্রে আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। যাহা হউক, ভাল হইল, আমি পাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। আমি মোহর গ্রহণ করিব না, ধর্ম্মার্থে তোমাকে

পর্ব্বত পার করিয়া দিব। সনাতন বলিলেন, তুমি যদি ইহা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে অপর কোন দস্যু ইহার জন্য আমার প্রাণ বিনাশ করিবে। তৎপরে ভুঁঞা চারি জন পাইক সঙ্গে দিলে, সনাতন তাহাদের সাহায্যে রাত্রি-কালে নিবিড় বনের ভিতর দিয়া পর্ব্বত পার হইয়া আসি-লেন। পরপারে আসিয়াই ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকটে আর একটী মোহর আছে কি না বল। ঈশান বলিল আছে, তখন সনাতন তাহাকে বলিলেন, তুমি মোহর লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, আমার সঙ্গে তোমার আর যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। সনাতন ছিন্নকন্থা ও করোয়া মাত্র সঙ্গে লইয়া একাকী নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে অতি দীন হীন বেশে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে হাজিপুর গ্রামের এক উদ্যানে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। এই হাজীপুর বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত। এখানে গৌড়েশ্বরের কর্ম্মচারীগণ বাস করিতেন। সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত একজন রাজকর্ম্মচারী। তিনি রাজার আদেশে, ঘোটকের মূল্যস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা লইয়া পাত-সাহকে দিবার জন্য দিল্লী যাইতেছিলেন। সম্প্রতি পথিমধ্যে হাজীপুরের এই উদ্যানমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরপিপাসু দীনাত্মা সনাতন প্রেমে পুল-কিত হইয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে-ছিলেন, শ্রীকান্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের উপর হইতে

সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। পরে একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া রজনীযোগে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফকিরবেশধারী সনাতনের ছিন্নকন্থা মলিন বসন ধূলিধূসরিত অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ অঙ্গ অবলোকন করিয়া শ্রীকান্তের চক্ষে জল আসিল। খিন্ন হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, হায়! সনাতন, তোমার একি দশা! তোমার রাজ্য সম্পদ কোথায় গেল? সুখের শরীরে এত ক্লেশ কিরূপে তুমি সহ্য করিবে? তুমি এই কঠোর বৈরাগ্য পরিত্যাগ কর, গৃহে বসিয়া শ্রীহরির আরাধনা কর, তোমার এই দীনবেশ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। শ্রীকান্তের সকরুণ স্নেহবাক্য শ্রবণ করিয়া সনাতন বলিলেন, ভাই, আমাকে আর একথা বলিও না, আমার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, তুমি গৃহে গমন কর। তদনন্তর দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সনাতন আপনার বন্ধন মোক্ষণের কথা সবিশেষ বলিলেন। শেষে শ্রীকান্ত এইখানে দুই দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সনাতন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার উৎকট বৈরাগ্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া শ্রীকান্ত আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কেবল শীত নিবারণের জন্য একখানি শাল দিলেন। সনাতন হাস্য করিয়া তাহা দূরে পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীকান্ত পুনর্ব্বার একখানি বনাত আনিয়া দিলেন। মূল্যবান জানিয়া সনাতন তাহাও গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে শ্রীকান্তের অনুরোধে একখানি ভোট-কম্বল শীত নিবারণের জন্য লইয়া একাকী গৌরচন্দ্রের উদ্দেশে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকান্তদত্ত ভোটকম্বল গায়ে দিয়া বৈরাগী সনাতন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া অতি কষ্টে বারাণসী ধামে উপনীত হইলেন, এবং পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে কোথায় চৈতন্য কোথায় চৈতন্য বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরবারি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করে, প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের প্রেমের আকর্ষণে সনাতনের ভাবসিন্ধু সেইরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ডস্থল ভাসাইয়া গলদশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। আপনার পাপ দুর্ব্বলতা বিষয়ভোগ আর গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বল স্বর্গীয় ভাব চিন্তা করিয়া সনাতনের আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইয়াছে। বৃথা এতদিন বিষয়মদে উন্মত্ত হইয়া কেবল প্রবৃত্তির সেবা করিলাম, আপনার প্রকৃত কল্যাণ চিন্তা করিলাম না, এই মর্ম্মভেদী অনুশোচনার যন্ত্রণাতে বিদ্ধ হইয়া অতি দীন হীন কাতরভাবে বিলাপ করিতেছেন, আর গৌরের অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যচন্দ্র প্রয়াগ হইতে নৌকারোহণে কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখর নামক একজন বৈদ্যজাতীয় শিষ্যের গৃহে বাস করিতেছিলেন। সনাতন লোকমুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “আমি নীচ অতি অধম, ভিতরে যাইতে আমার অধিকার নাই,” এই মনে করিয়া সনাতন ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। শিষ্যবৎসল প্রেমার্দ্রচিত্ত নিমাইচন্দ্র সনাতনের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে

লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর সনাতনকে দেখিয়া গিয়া বলিলেন, দ্বারে বৈষ্ণব কোথায়? একজন দরবেশ রহিয়াছে। চৈতন্য বলিলেন, তাহাকেই লইয়া আইস। সনাতন চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আনন্দ মনে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। সনাতনকে দেখিয়া চৈতন্য প্রেমোন্মত্তচিত্তে দৌড়িয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন অশ্রুসিক্ত গদগদ-বচনে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া চৈতন্যের সম্মুখে আত্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

"দুই গুচ্ছা দুই করে, এক গুচ্ছা দন্তে ধরে,
পড়িল গৌরাঙ্গ রাজা পায়।
দুনয়নে শতধারা, যেন রাজদণ্ডী পারা,
অপরাধী আপনা মানায়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয় ভোগ, কামাদি ষড়বর্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥
নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি,
এ অধম জনারে বিচার॥

সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য বিষাদ,
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন করিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহে কভু,
ঘৃণাস্পদ মোর এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় ত্যজ্য,
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ।"

ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিগলিত হইয়া সনাতনের গলা ধরিয়া পুনঃ পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। প্রভুস্পর্শে সনাতনের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। চৈতন্য সনাতনকে নানাপ্রকার প্রবোধ বচনে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। দুইটি প্রচণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী একত্র মিলিত হইলে যেমন তটাভিঘাতি-তরঙ্গ-লহরী উত্থিত হয়, ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য ও সনাতনের মিলনও তদ্রূপ। উভয়কে সন্দর্শন করিয়া উভয়ের প্রাণ প্রেমরসে অভিষিঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহাদের হৃদয়-সিন্ধুতে ভাবের শত সহস্র তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, এবং তাহা উদ্বেলিত হইয়া প্রেমাশ্রু রূপে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অজস্র নিঃসৃত হইতেছে। চন্দ্রশেখর তাঁহাদের ভক্তিরসরঞ্জিত প্রেম-বিস্ফারিত মুখশ্রী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। গৌরসুন্দর সনাতনের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পিঁড়ার উপরে উপবেশন করাইলেন, এবং প্রেমভরে অঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। সনাতন বলিলেন, প্রভু, আমাকে

কেন স্পর্শ করিতেছেন? আমি অতি অধম নারকী। সনাতনের দৈন্য বিলাপ অনুশোচনা অবলোকন করিয়া চৈতন্য বলিলেন, তুমি দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হে সনাতন! পতিতপাবন শ্রীহরির দয়া অপরিসীম। তিনি তোমাকে মহারৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি এত দিন বিষয়কূপে নিমগ্ন ছিলে, কৃপাময় শ্রীহরি তোমাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। তুমি যথার্থ ভক্তোত্তম সাধু, ভক্তিবলে তুমি ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি পরম ভাগবৎ এবং পরমতীর্থ। ভাগবতে যুধিষ্টির ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে বলিয়াছেন,

"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"*

ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। যাঁহাদিগের হৃদয়ে গদাধর হরি নিরন্তর বিরাজমান, মলিনজনসম্পর্কে তীর্থ অপবিত্র হইলে তাহার পবিত্রতাবৃদ্ধির জন্যই তাঁহারা তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, নতুবা তীর্থভ্রমণে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই।

সনাতন বলিলেন, আমি শ্রীহরিকে জানি না, আপনার অনুগ্রহই আমার উদ্ধারের হেতু।

"প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ,
তোমার দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়,
হইল যে তোমায় উন্মুখ॥

* শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়, অষ্টম শ্লোক।

কৃষ্ণকৃপা তোমাপরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয়কূপ হইতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥”

ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

“তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইল সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদগদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥"

চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড, ২০ শ পরিচ্ছেদ।

কিরূপে বিষয়বন্ধন উন্মোচিত হইল, চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন আদ্যোপান্ত বলিলেন। চৈতন্যের আদেশে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের মিলন হইল। মিশ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। চৈতন্য বলিলেন, ইহাঁর ফকিরের বেশ দূর করিয়া ক্ষৌর করাও। * অতঃপর ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া সনাতন গঙ্গাস্নান করিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন একখানি বস্ত্র দিলেন। নূতন বস্ত্র দেখিয়া বৈরাগী সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। দীনভাবে বলিলেন, যদি বস্ত্র দিতে অভিলাষ হয়, একখানি পুরাতন বস্ত্র দিন। তপন মিশ্র নিজের পরিধেয় একখানি পুরাতন কাপড় দিলেন, সনাতন তাহা দুই খণ্ড করিয়া বহির্ব্বাস ও কৌপীন

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রূপ সনাতন মুসলমান রাজার দাসত্ব করাতে কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দাড়ি গোঁপ রাখা তখন এদেশে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না। এই জন্য চন্দ্রশেখর বহির্দ্বারে প্রথমে সনাতনকে দেখিয়া হিন্দু-সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; দরবেশ ফকির মনে করিয়াছিলেন। সনাতনের এই ফকিরের বেশ, পরবর্ত্তী-কালে আউল, সাঁই, নাড়া, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকগণের দাড়ি গোঁপ রাখার প্রমাণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। উহারা আপনাদিগকে চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ মুসলমান ফকিরের বেশ ধারণ করে ও কেহ কেহ অনেকাংশে মুসলমানের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, "সনাতন দরবেশ ছিলেন" বলিয়া প্রমাণ উল্লেখ করিতেও দেখা যায়।

করিয়া পরিলেন। এইরূপে বারাণসীতীর্থে ভক্তগণের সঙ্গে সনাতন পরিচয় লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সেখানে দাক্ষিণাত্যবাসী এক দ্বিজ বাস করিতেন। তিনি বলিলেন, সনাতন, তুমি যত দিন কাশীতে থাকিবে, আমার বাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ থাকিল। সনাতন বলিলেন, আমি মাধুকরী * করিব, ব্রাহ্মণের গৃহে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিব না। রাজমন্ত্রী এখন দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া উদর পোষণ করিতে লাগিলেন। সনাতনের ঈদৃশ বৈরাগ্য দেখিয়া চৈতন্য অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতনের গাত্রে ভোট-কম্বল রহিয়াছে, বহু মূল্য ভোট-কম্বল বৈরাগ্যের পক্ষে অবৈধ; এজন্য চৈতন্য বারম্বার কম্বলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন শ্রীচৈতন্যের মনের ভাব অবগত হইয়া ভোট-কম্বল ত্যাগের পন্থা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, একজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব গঙ্গাতীরে একখানি কাঁথা শুকাইতে দিয়াছে। সনাতন উক্ত বৈষ্ণবকে কম্বল দিয়া তাহার কাঁথাখানি চাহিয়া লইলেন। সনাতনের গাত্রে কন্থা দেখিয়া চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভোট-কম্বল কোথায় গেল? সনাতন সকল কথা নিবেদন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, সৎবৈদ্যে কখন রোগের শেষ রাখেন না। যে শ্রীহরি অপার কৃপাগুণে তোমার বিষয়রোগ দূর করিলেন,

* মধুকর যেমন প্রতি পুষ্প হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় করে, তদ্রূপ দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করার নাম মাধুকরী অর্থাৎ মধুকর-বৃত্তি। বৃন্দাবনে অদ্যাপি শত শত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মাধুকরী অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন।

তিনি আর রোগের শেষ কেন রাখিবেন? তুমি তিন মুদ্রার ভোটকম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিবে, ইহা বৈরাগীর পক্ষে অধর্ম্ম এবং উপহাসজনক। হে সনাতন! দেহ গেহ পুত্র দারা বিষয়ভোগ প্রভৃতি সকল আশা পরিত্যাগ না করিলে হরিধন লাভ হয় না।

"সনাতনের হাতে ধরি, বসাইলা গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোটকম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটখান আগে চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি করিলা॥
ভোটকম্বল খানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তারে দিয়া তার কন্থাখানি।
পরিবর্ত্ত করি নিল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শ্লাঘ্য মানি॥
সেই কাস্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।
প্রভু বলে তাহা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।

দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥”
ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাশীধামে “সনাতন-শিক্ষা”।

তত্ত্ববিচার বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য ও ভক্তিপিপাসা এবং ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া চৈতন্যের মন প্রসন্ন হইল। সনাতন ব্যাকুল-হৃদয়ে বিনীত হইয়া চৈতন্য-চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভু, আমি নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, অধম ও পতিত। বিষয়-মদে উন্মত্ত হইয়া বৃথা কালক্ষেপণ করিয়াছি; আপনার যথার্থ হিতাহিত কিছুই জানি না। যদি কৃপা করিয়া বিষয়কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা উপদেশ করুন। আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় কেন আমাকে জীর্ণ করিতেছে? কি করিলে আমার মঙ্গল হয়? সাধ্যবস্তু এবং সাধনতত্ত্বই বা কি? এই সকল গূঢ়তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন।

“তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥

নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥
কৃপাকরি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি॥
কৃপাকরি সবতত্ত্ব কহত আপনি ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য খণ্ড ২০শ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য বলিলেন, সনাতন, ভগবৎকৃপা তোমাতে পরিপূর্ণ; তুমি সকল তত্ত্বই অবগত আছ। তুমি ভগবানের শক্তিধর, তোমাকে কি আর ত্রিতাপে তাপিত করিতে পারে? সমুদায় জানিয়াও দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য প্রশ্ন করা সাধুর স্বভাব, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ। জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষে তুমিই যোগ্যপাত্র, তথাপি ক্রমে ক্রমে সকল তত্ত্ব বলিতেছি।

ইহার পর শ্রীচৈতন্য দুই মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সনাতনকে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের গভীর সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন। * আমরা অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার উল্লেখ

* ইতিপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং প্রয়াগে শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা উপদেশ দিয়া-

করিতেছি। এই তত্ত্বালোচনাতে প্রধানতঃ চারিটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। যথা,—প্রথমতঃ তত্ত্ববিচার বা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব; দ্বিতীয়তঃ, জীবতত্ত্ব অর্থাৎ জীবের যথার্থ স্বরূপ কি? তৃতীয়তঃ, জীবের কর্ত্তব্য কি? চতুর্থতঃ, জীবের চরম উদ্দেশ্য কি? বৈষ্ণবশাস্ত্রকারেরা এই চারিটী বিষয় সাধ্য, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য প্রথমে তত্ত্ববিচার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

চৈতন্য বলিলেন, হে সনাতন! তত্ত্ববিদেরা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় অবিনাশী জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। জ্ঞানীরা ইহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, হিরণ্যগর্ভোপাসক যোগীগণ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তেরা লীলাবিহারী ভগবানরূপে কীর্ত্তন করেন। * এই সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যও অনন্ত। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তিতে তাঁহার অনন্ত শক্তি। † তিনি সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বে-

ছিলেন, সেই সমস্ত তত্ত্ববিচার সনাতনকে শিক্ষা দেন। ইহা বৈষ্ণবসমাজে "সনাতন-শিক্ষা" নামে প্রসিদ্ধ। রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জল নীলমণি, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

* "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ।

† সমগ্র ঐশীশক্তিকেই এখানে চিচ্ছক্তি বলা হইয়াছে। ইহা অন্তরঙ্গা বা ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি, অর্থাৎ এই শক্তি ঈশ্বরে নিত্য বিরাজমান। ইহার অভাবে ঈশ্বরসত্তা অসম্ভব। সৃষ্টিশক্তির নাম মায়াশক্তি, ইহা ঈশ্বর হইতে প্রকটিত হইয়া জগৎসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত। কিন্তু এই সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী মায়িকশক্তি ভগবৎসত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এইজন্য ইহার

শ্বর্য্যপূর্ণ, আত্মার আত্মা পরমাত্মা চিদানন্দরূপী ভগবান। ইহাঁকেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলা যায়। ভক্তের হৃদয়ে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য ও অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান; ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতীত সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব। এই ত্রিবিধ শক্তির মিলনেই বিশ্ব-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। জড়রূপা প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়। অন্ধ জড়শক্তি হইতে অনন্তবৈচিত্র্যের আধার, অনন্ত-শোভাসৌন্দর্য্যময় জ্ঞানকৌশলপরিপূর্ণ বিশ্ব রচিত হওয়া অসম্ভব। ঐশীশক্তিই বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ। লৌহ যেমন অগ্নি সংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐশী-শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃতি জগৎরচনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ।* ভগবৎশক্তি প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইলে তাহা অবতার নামে সংজ্ঞিত হয়। উপক্ষয়-শূন্য জলধি হইতে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বনিধি পরমেশ্বর হইতে অসংখ্য

নাম বহিরঙ্গা। আর অসংখ্য প্রাণীপুঞ্জের মধ্যে ঈশ্বরের যে চৈতন্য বা চিচ্ছক্তি উপহিত হইয়া থাকে তাহাই জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছা-নুসারে ইহা কখন তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে কখন থাকে না; এজন্য ইহাকে তটস্থা বলে। (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ বলেন, "জীবতত্ত্বই কৃষ্ণের জীবশক্তি নামক একটী শক্তি।" তৎসম্পাদিত "চৈতন্যচরিতামৃত"—আদি লীলা।)

* ন্যায়শাস্ত্রে কুম্ভকারের দণ্ড চক্রাদিকে ঘটের নিমিত্তকারণ ও মৃত্তিকাকে উপাদানকারণ বলে।

অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। * অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীহরির কেহ অংশাবতার, কেহ গুণাবতার, কেহ ভাবাবতার, কেহ শক্ত্যবতার। † হে সনাতন! এখন যুগাবতারের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয়ে ভগবান শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত, ক্রমান্বয়ে এই চারি বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ‡ যুগধর্ম্ম স্থাপনের

---

* "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"

ভাগবত ১ম স্কন্ধ।

† বৈষ্ণবশাস্ত্র "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার, অংশাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, যুগাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি অবতার এবং স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশরূপ, প্রাভব ও বৈভববিলাস ইত্যাদি অবতারতত্ত্বসম্বন্ধীয় সাংখ্য ও বৈদান্তিক-বিচারের জটিল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সাধারণ পাঠকের বিরক্তিকর হইবে বিবেচনায় তাহার স্থূলভাব মাত্র এখানে গৃহীত হইল।

‡ কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, ইহা প্রমাণের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ভাগবতের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

ভাঃ ১০ম স্কন্ধ।

শ্রীধর স্বামীর টীকা সম্মত এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে, গর্গাচার্য্য কৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে ব্রজে আসিয়া নন্দকে বলিতেছেন, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর ধারণ করাতে অন্যান্য যুগে ইঁহার শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। সম্প্রতি (দ্বাপরযুগে) ইনি কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছেন, এজন্য ইঁহার নাম 'কৃষ্ণ' হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতীত কালের

জন্য সত্যযুগে ধ্যান-ধারণা, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ, দ্বাপরে পূজার্চ্চনা, এবং কলিযুগে কেবল নামসংকীর্ত্তন প্রচার করাই যুগাবতারের কার্য্য। অন্যান্য যুগে ধ্যান-ধারণাদিতে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।* কলিযুগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সনাতন বলিলেন, কলিতে পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার কে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। গৌর উত্তর করিলেন, অন্যান্য যুগের অবতার যেমন শাস্ত্রপ্রমাণে অবগত হওয়া যায়, কলিযুগের অবতারও সেইরূপ শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারা যায়। অবতার নিজমুখে কখন আত্মপরিচয় দেন না।

'আসন্' ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকালে প্রয়োগ অবধারণ পূর্ব্বক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, ইনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিবেন। এই ব্যাখ্যাতে শ্লোকের 'পীতবর্ণ' শব্দ লক্ষ্য করিয়া গৌরাঙ্গাবতারের আভাস প্রদান করা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী এই প্রকারে ভাগবত ও মহাভারতের আরও কতিপয় শ্লোক কৌশল সহকারে উদ্ধৃত করিয়া ও অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কলিযুগে কৃষ্ণাবতার প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার বিপরীতে কলিযুগে পীতবর্ণ অবতারের বিষয় সনাতনকে বলিয়াছিলেন কি না নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণ করিয়া আমরা এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

* ভাগবত—দ্বাদশ স্কন্ধ। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবং॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৬ষ্ঠ অংশ।

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা, এবং দ্বাপরে পূজা অর্চ্চনা করিয়া লোক সকল যে ফলপ্রাপ্ত হয়, কলিযুগে কেবল কেশবকীর্ত্তনের দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকার মুনিগণ অবতারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের শাস্ত্রবাক্যে এই সকল জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। লক্ষণ দুই প্রকার, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ লক্ষণ, কার্য্য দ্বারা যে জ্ঞান, তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। সনাতন বলিলেন, আপনি বলিতেছেন, কলিযুগের অবতার পীতবর্ণ এবং নামসংকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি প্রচার তাঁহার কার্য্য; এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কে? স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমার সংশয় নিরাকৃত হউক। সনাতনের ইচ্ছা শ্রীগৌরাঙ্গ নিজমুখে আপনার অবতারত্ব ঘোষণা করেন, এই জন্য এই প্রকার কৌশলময় প্রশ্ন করিলেন। চৈতন্য প্রভু সনাতনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সনাতন, চাতুরী পরিত্যাগ কর, শক্ত্যাবেশাবতারের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে ভগবৎশক্তির প্রকাশ, তাহাই শক্ত্যাবেশাবতার, ইহা মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। যাহাতে ভগবানের জ্ঞান শক্ত্যাদির সাক্ষাৎ প্রকাশ, তাহা মুখ্য। যেমন সনক সনাতনাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি, ব্রহ্মাতে সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি, পৃথুতে পালনীশক্তি, পরশুরামে দুষ্টের দমনশক্তি প্রকাশিত; এই জন্য ইহাঁরা মুখ্য-শক্ত্যাবেশাবতার। যে বস্তুতে ভগবচ্ছক্তির আভাসমাত্র স্ফুরিত, তাহাকে বিভূতি বলা যায়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবং॥"

যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত ও বলপ্রভাবাদি

সম্পন্ন, তৎসমস্তকেই আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত বলিয়া জানিবে। লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রভৃতি অনন্তলীলা। অনন্ত দেশে অনন্ত কালে তাঁহার নিত্যলীলাতরঙ্গ তরঙ্গিত হইতেছে। তিনি চির-নূতন চিরসৌন্দর্য্যময়। জ্ঞানৈশ্বর্য্যপূর্ণ মথুরা ও দ্বারকাধামে তিনি পূর্ণ ও পূর্ণতররূপে প্রকাশিত; কিন্তু মাধুর্য্যময় প্রেম-ধাম গোকুলে তাঁহার পূর্ণতম প্রকাশ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্ত নাই, জীব কোন ছার, ব্রহ্মা শিব সনকাদি কেহই তাঁর অন্ত পান না। শ্রুতি সকলও ইহাঁর বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান; তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনি সকল কারণের মূল কারণ, তাঁহার আদি নাই, কিন্তু তিনি সকলেরই আদি ও গোবিন্দ অর্থাৎ বিশ্ব-সংসার সমস্তই জানিতেছেন। আপনার চিচ্ছক্তিতে তিনি সদা বিরাজিত।' হে সনাতন,

"কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল এক বিন্দু॥"

এই প্রকারে ভগবানের অনন্ত মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল গৌরসুন্দরের মন ভগব-দৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। প্রেমরসে রসান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন;

"সনাতন কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক ব্যাপে যার পুর॥
স্মিতকিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।

* * * *

লোকধর্ম্ম লজ্জাভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কাননের ভিতর বাসা করে
আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ আন বলিতে বলে আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড, ২১ পরিচ্ছেদ।

প্রেমে গদগদ হইয়া চৈতন্য বলিলেন, সনাতন! শ্রীহরির

মাধুর্য্যস্রোতে আমি ভাসিয়া যাইতেছি, আমার চিত্তভ্রম উপস্থিত, কি বলিতে কি বলিতেছি কিছুই জ্ঞান নাই। তোমার প্রতি ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ। নিজের ঐশ্বর্য্য-মাধুরী তিনি আমার মুখে তোমাকে শ্রবণ করাইলেন।

"পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে
আন কহিতে কহিল আনে
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি ॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড, ২১ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম অধ্যায়।

সম্বন্ধ-বিচার বা জীবতত্ত্ব।

জীবের স্বরূপ কি ?—এবং জীবের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধই বা কি, ইহারই নাম সম্বন্ধতত্ত্ব। হে সনাতন! শ্রীহরির নিত্যদাসত্বই জীবের যথার্থ স্বরূপ। জীব পরমেশ্বরের

অনন্তকালের সেবক। সূর্য্যকিরণের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ যেমন অগ্নিজ্বালারূপে প্রকাশ পায়, জীব সেইরূপ ভগবৎ-শক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। পরমেশ্বর অসীম-অনন্ত-জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি মায়ার অধিপতি।* জীব জ্ঞানশক্তিতে ঈশ্বরের সমধর্ম্মী, কেবল

---

* অনন্তশক্তিশালী পরমেশ্বরের সামান্য একাংশমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজনপালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ইহাকেই বেদান্তদর্শনাদিতে মায়া বা প্রকৃতি বলিয়া থাকে।

"ন কৃৎস্ন ব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক দেশভাক্।" পঞ্চদশী।

অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির নাম মায়া, তাহা তাঁহার পূর্ণশক্তি নহে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণশক্তির একদেশমাত্র। ইহা অপূর্ণশক্তি, সুতরাং সদসৎভাবাপন্ন। সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণাত্মক মায়া পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত ও তাঁহার অধীন, আর জীব ইহার বশীভূত বলিয়া তাহার রজ্জুতে সর্পভ্রম ও দেহে আত্মবোধ উপস্থিত হয়। এই ভ্রমজ্ঞানের সাধারণ নাম মায়া। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ, অপূর্ণ; এই অপূর্ণতাবশতঃ ভ্রমজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহা তাহার সত্তাগত। ঈশ্বর অপূর্ণশক্তিতে সৃষ্টিলীলা করিয়াছেন বলিয়াই জীবপ্রকৃতিতে এই অপূর্ণতা বিদ্যমান। নচেৎ পরম করুণাময় বিধাতা মানবকে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমে ফেলাইয়াছেন, এমন বলা যায় না। আর এক প্রকার মায়া বা ভ্রম আছে, তাহা জীবের স্বকর্ম্মার্জ্জিত। ইহা মানবের সংসারাসক্তি ও অহঙ্কারজনিত ভ্রান্তবুদ্ধি। মানব যাহাতে এই মায়ামোহ অতিক্রম করিয়া শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য ভগবান তাহার হৃদয়ে স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি (conscience) নিহিত করিয়াছেন, ও অন্যান্য অশেষবিধ উপায় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি যখন মানব কুপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হয়, তখন সে আপনিই আপনার দুঃখ যন্ত্রণার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মায়ার বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসুগণ "পঞ্চদশী" প্রভৃতি বেদান্ত দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

পরিমাণের ন্যূনাতিরেক। জীব যৎসামান্য পরিমিত চিচ্ছক্তির আধার বলিয়া অবিদ্যার অধীন। ভগবানের অংশসম্ভূত ও প্রকৃতিগত অভিন্ন হইলেও ভগবানের সেবকত্বই জীবের প্রকৃতি। সে আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও সেবকত্ব অনুভব করিতেছে। কিন্তু মায়াভিভূত হইয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং আপনার প্রভু ও আশ্রয়দাতাকে ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকারে সংসার-দুঃখ ভোগ করে। এই বহির্ম্মুখ জীবের অশেষ দুর্গতি। অপরাধী ব্যক্তিকে রাজা যেরূপ নদীজলে ডুবায় ও উঠায়; মোহমায়া সেইরূপ ভগবদ্বিমুখ আত্মবিস্মৃত মানবকে কখনও বা স্বর্গভোগে প্রলুব্ধ করে, কখনও বা ভীষণ নরকে নিমগ্ন করে। কিন্তু দেখ, ভগবান কি দয়াময়, মায়ামুগ্ধ জীব চির-কাল তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকে, এই নিমিত্ত তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি বেদপুরাণাদি শাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা এবং স্বয়ং অন্তর্যামী চৈত্ত্যআচার্য্যরূপে মানবহৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া অনুক্ষণ আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। শাস্ত্রের উপদেশ, ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তির কৃপা ও পবিত্র সহবাসে জীব ঈশ্বরো-ন্মুখ হয় এবং মোহের অবসানে পরমেশ্বরই "প্রভু ও পরি-ত্রাতা" এই জ্ঞান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তির পিতা অনেক ধন গৃহমধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া অন্যত্রে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্র, পিতৃত্যক্ত ধনের বিষয় কিছু না জানিয়া দারিদ্র্য দুঃখে দিনপাত করিতেছে। এমন সময় কোন সর্ব্বজ্ঞ গণক আসিয়া তাহাকে পিতৃধনের বিষয় বলিলে, সে ব্যক্তি ঘর খুঁড়িয়া ধনের উদ্দেশ করিতে লাগিল। দৈবজ্ঞ বলিল, দক্ষিণ দিকে খনন করিও না, ভীমরুল বোল্‌তা

আছে, দংশন করিবে; পশ্চিমে যক্ষ আছে, সে বিঘ্ন ঘটাইবে; উত্তরে অজগর সর্প আছে, ওদিকে যাইও না; পূর্ব্বদিকে অল্প মৃত্তিকা তুলিলেই ধন পাইবে। সেইরূপ সাধু গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, জ্ঞান কর্ম্ম ও যোগমার্গ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শুদ্ধভক্তি যোগে ভজনা করিলেই শ্রীহরিকে লাভ করা যায়। ধন হস্তগত হইলে যেমন পার্থিব সুখ সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সুখ লাভ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়; সেইরূপ বিশুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তিতে জীবের মায়াবন্ধন উন্মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে প্রেম উৎপন্ন হয় এবং পরমেশ্বরের প্রেমমাধুর্য্যে চিত্ত সমাকৃষ্ট হইলে সংসার ক্লেশের শান্তি হয়। কিন্তু সংসার-তাপের শান্তিমাত্রই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য নহে, ভগবানকে লাভ করা ও জীবনে তাঁহাকে সম্ভোগ করাই ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংসারিক সুখ দুঃখের চিন্তা ভক্তের প্রাণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ভগবানই ভক্তের লক্ষ্য, তাঁহাকে লক্ষ্য স্থলে রাখিলে আনুষঙ্গিকরূপে সংসার-যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সারকথা এই যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করিতেছেন, জীব তাঁহার অংশ। জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব শ্রীহরির সেবানন্দ সম্ভোগ করিয়া চিরসুখী; তাঁহাদের প্রাণ মন হরিপাদারবিন্দে নিত্যকাল উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। মুক্ত জীব কৃষ্ণ লীলার সহায় ও তাঁহার পারিষদ। ভগবদ্বহির্ম্মুখ সংসার-সর্ব্বস্ব বদ্ধজীব ত্রিতাপে সদাই পরিতপ্ত ও নিরন্তর কাম ক্রোধের অত্যাচারে প্রপীড়িত। দৈবযোগে

যদি কোন সাধু-বৈদ্যের মন্ত্রোপদেশে মায়া-পিশাচী তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, হরিভক্তি লাভ করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়।

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ্ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশে মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ।

অষ্টম অধ্যায়।

অভিধেয় তত্ত্ব।

ভগবানের কৃপালাভের উপায় স্বরূপ ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ভক্তি-দ্বারাই ভগবানকে ও ভগবৎপ্রেমধন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একমাত্র ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণভজনের মুখ্য উপায়। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানসাধনের ফল অতি তুচ্ছ। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তাবৎ সাধু কর্ম্মকে কর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কর্ম্ম থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকিবে। "আমি করিতেছি" এবম্প্রকার অহঙ্কারজনিত কর্ত্তৃত্বাভিমান কর্ম্মানুষ্ঠানে অনিবার্য্য; সুতরাং তাহা কখনও ভগবৎ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। ভক্তি বিনা ভগবানকে লাভ করা যায় না। বেদবেদান্তাদি রাশি রাশি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহারা আপনাকে জ্ঞানী মনে করে, তাহারা অতি ভ্রান্ত। ভক্তিশূন্য জ্ঞানে মুক্তি নাই। ভাগবতে কথিত হইয়াছে;

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥" ভা, ১০ম স্কন্ধ।

হে বিভো! যে সকল সাধক শ্রেয়স্কর ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভার্থ যমনিয়মাদির ক্লেশ স্বীকার করে, তুষাবঘাতীর ন্যায় * তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, কেবল ক্লেশমাত্রই সার হয়। হৃদয় মন ঈশ্বরাভিমুখ হইলে বিনা জ্ঞানেও মুক্তি লাভ হয়। অর্থাৎ প্রাণ মন ঈশ্বরোন্মুখ হইলে আপনা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ

* তণ্ডুল লাভের আশায় যাহারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধানা পরিত্যাগ করিয়া স্থূলপ্রমাণ তুষ আঘাত করে।

ও ভিক্ষুক এই চতুরাশ্রমের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি পালনের নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, এই বিধিবিহিত বর্ণাশ্রমাচারীগণ হরিভক্তিবিহীন হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করে, কিন্তু হরিভক্তি ব্যতীত বুদ্ধি কখনও নির্ম্মল হয় না। ভাগবতে ব্যাস বলিয়াছেন, "হে পদ্মলোচন হরি, তোমাতে ভক্তির অভাব থাকিলে বুদ্ধি কখনও বিশুদ্ধ হয় না, এইরূপ অবিশুদ্ধ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আপনাদিগকে মুক্ত মনে করিয়া থাকে। তাহারা পরম পদ মোক্ষের সন্নিহিত হইয়াও তোমার পদারবিন্দ অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে।"

হে সনাতন! পরমেশ্বরের জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় পুণ্যস্বরূপের নিকট মায়ার অন্ধকার কখন কি তিষ্ঠিতে পারে? যে ব্যক্তি ব্যাকুল প্রাণে "হে হরি আমি তোমার" এই বলিয়া একবার প্রার্থনা করে, সে মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হয়। কি ভোগাভিলাষী, কি মুক্তিপিপাসু, কি অন্যবিধ কামনাপরায়ণ যিনিই হউন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই গাঢ় ভক্তিযোগে শ্রীহরির ভজনা করিয়া থাকেন। বিষয় কামনা করিয়া কেহ যদি ভগবানের আরাধনা করে, প্রার্থনা না করিলেও ঈশ্বর তাহাকেও আপনার আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ভগবান বলেন, আমার ভজনা করিয়া বিষয়সুখ প্রার্থনা করা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ প্রার্থনা করার ন্যায় কেবল মূর্খতা! আমি এরূপ মূর্খকে আমার চরণাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে বিষয়বিষে কেন জর্জ্জরিত হইতে দিব। বস্তুতঃ বিষয়লোভে ভগবানের আরাধনা

করিয়া তাঁহাতে নিবিষ্টচিত্ততা বশতঃ কথঞ্চিত প্রেমরসের আস্বাদ পাইলে সমুদায় কামনা বিসর্জ্জন করিয়া ভগবানের দাস হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেই অভিলাষ হয়। ভক্তরাজ ধ্রুব বলিয়াছিলেন,

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যং
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥"

হে দেব! লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমি সেইরূপ রাজসিংহাসনাভিলাষী হইয়া তপস্যা করতঃ মুনীন্দ্রদিগের দুর্ল্লভ ধন তোমাকে পাইয়াছি। হে প্রভো! কৃতার্থ হইলাম, আমার আর বর লইবার প্রয়োজন নাই।

"কৃষ্ণ ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান,
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দিতে নাহি বল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

* * * * *

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥
কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তাঁরে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এতবড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কামছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড, ২২ পরিচ্ছেদ।

হে সনাতন! নদীপ্রবাহে ভাসমান কোন কাষ্ঠখণ্ড কদাচিৎ যেমন তীরসংলগ্ন হয়, সাংসারিক জীবেরও, সেই অবস্থা। কালরূপনদীবেগে আহৃত জীবদিগের মধ্যে ভাগ্য-বলে কদাচিৎ কেহ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। ভগবদনুগ্রহে সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসমাগম লাভ হয়। সাধুসহবাসে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া পরমেশ্বরেতে রতির উদয় হয়। এবং কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে করুণাময় ঈশ্বর অন্ত-র্যামী চৈত্ত্যআচার্য্যরূপেও আপনার তত্ত্ব শিক্ষা দেন। ভাগবতে উদ্ধব ভগবানকে বলিয়াছেন,

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।"

হে ভগবন্! তুমি শরীরধারী জীবের সর্ব্বপ্রকার অশুভ দূর করিয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বগতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বাহিরে গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছ। সনাতন! সাধুসঙ্গের অপার মহিমা। সাধুসঙ্গ দ্বারা হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিফল ভগবৎপ্রেম উৎপন্ন হয় ও সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক সাধুকৃপা ব্যতীত, সৎবিষয়ে রতি ও ভগবানে ভক্তি দূরে থাকুক, সংসার বাসনারই অবসান হয় না। সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে সূত বলিয়াছেন,

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ভগবদ্ভক্ত সাধুর সহিত অত্যল্প কাল সঙ্গ লাভ হইলে যে ফল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ ও অপবর্গেরই তুলনা হইতে পারে না। মনুষ্যদিগের অভীষ্ট তুচ্ছ রাজভোগসুখের সহিত কিরূপে তাহার তুলনা হইবে?

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধ হয়।"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ।

হে সনাতন! শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবানে নির্ম্মল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান যোগ সাধনার আর প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ প্রাণের ভোজনেই যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান অচ্যুতের আরাধনা করিলেই সকল কর্ম্ম কৃত হয়, ভাগবতে দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়াছেন। সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। * শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। শাস্ত্র যুক্তি ও জ্ঞানযোগে যাঁহার ভক্তি দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বোত্তম ভক্ত। যিনি শাস্ত্রযুক্তি অবগত নহেন, অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান তিনিও মহাভাগ্যবান, তাঁহাকে মধ্যম বলা যায়। যাঁহার শ্রদ্ধা অতি কোমল, তিনি কনিষ্ঠ। কিন্তু ইহাঁরাও ক্রমে ভক্তোত্তম হইবেন। রতি প্রেমের তারতম্যানুসারে ভক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। ভাগবতের

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "আত্মানাত্মবিবেক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "শ্রদ্ধা নাম গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।"

একাদশ স্কন্ধে ভক্তিলক্ষণে কথিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বভূতে আপনার ভগদ্ভাব দর্শন করেন, এবং পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন, তিনিই ভক্তোত্তম। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তাঁহার অনুগত ভক্তজনে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা ও শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে মধ্যম। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কি অন্যের পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত, অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারী; ক্রমশঃ তিনিও ভক্তোত্তম হইবেন। *

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥
শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্র যুক্তি শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহ তরয়ে সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ।

* ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়। ৪৩।৪৪।৪৫ শ্লোক।

হে সনাতন! বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ সাধুর জীবনে সকল মহাগুণের সঞ্চার হয়। সংক্ষেপে বৈষ্ণব লক্ষণ বলিতেছি,—শ্রবণ কর। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যবাদী, সমদর্শী, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ, * অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ, † মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী, এই সকল বৈষ্ণব-লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ভাগবতে দেবহূতিকে কপিলদেব বলিয়াছেন, সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদুঃখসহন-শীল, কারুণিক ও সকল প্রাণীর সুখদ; তাঁহার কেহ শত্রু নাই, তিনি শান্ত ও সরলস্বভাব এবং সুশীলতাই তাঁহার ভূষণস্বরূপ। হে সনাতন! সাধুসঙ্গ হইতেই হরিভক্তির জন্ম হয়। ভাগবতের উপদেশ এই,—পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মহৎসেবা, সাধুসঙ্গই মুক্তির দ্বার, আর যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গই নরকের দ্বার। সেই সাধুরাই মহৎ, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, প্রশান্তচিত্ত, ক্রোধশূন্য, বন্ধুভাবাপন্ন ও সদাচার-সম্পন্ন। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য অসীম। ভাগবতে কথিত হইয়াছে ;—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ।
সংসারেহস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোহপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং॥"
ভাঃ ১১ স্কন্ধ।

হে অনঘ ঋষিগণ! আপনাদিগকে এখন আত্যন্তিক মঙ্গলকর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারে ক্ষণকালমাত্র সৎসঙ্গ লাভেও মহানিধি লাভ হয়।

---

* যিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-চরণকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন।
† বিজিত ষড়্গুণ, অর্থাৎ ষড়রিপুজয়ী।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধ।

সাধুভক্তজনের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে, হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎসেবনেই শীঘ্র অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি ও অবশেষে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সনাতন! অসৎসঙ্গই অনর্থের মূল। অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ সদাচার। স্ত্রীসঙ্গীদিগকে অসাধু ও অভক্ত বলিয়া জানিবে।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধ।

রমণীসঙ্গ ও রমণীসঙ্গীদিগের সঙ্গ যেমন মোহ ও বন্ধনের কারণ, অন্যের সঙ্গ সেরূপ নয়।

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি-র্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ং ॥"

ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধ।

অসৎসঙ্গহেতু সত্য, শৌচ, দয়া, সৎপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"অশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষুচ।"
ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধ।

যাহারা অশান্ত, মূঢ়, খণ্ডিতাত্মা অর্থাৎ দেহেতে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, যাহারা শোকের পাত্র এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় যোষাগণের একান্ত অধীন; সেই সকল অসাধু জনের সঙ্গ করিবে না। অগ্নিদাহ মধ্যে লৌহপিঞ্জরে অবস্থান করাও বরং ভাল, তথাপি হরিচিন্তাবিমুখজনের সহিত একত্র বাস করা উচিত নহে। ভক্ত বৈষ্ণব এই সকল দুঃসঙ্গ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অসার কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ অকিঞ্চন হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তি-মান ভক্তবৎসল করুণাময় ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণ কখন অন্যের ভজনা করেন না। শরণাগত অকি-ঞ্চন ভক্তের লক্ষণ এই,—ঈশ্বরসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করিবেন' এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্য্য সাধনে সুখ দুঃখ চিন্তা না করিয়া আত্ম-নিক্ষেপ করা, এবং তাঁহার শরণ বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত মতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন;—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"
ভাঃ ১১শ স্কন্ধ।

অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার সেবাকার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন।

অনন্তর চৈতন্য বলিলেন, হে সনাতন! এইরূপে সাধুসঙ্গ ও শরণাগতি লাভ হইলে, মানব ভক্তিসাধনের যোগ্য হয়, মানব-অন্তরে স্বভাবজাত কতকগুলি ভাব নিহিত আছে, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্দ্বারা সেই ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করা যায়, তাহার নাম সাধনভক্তি। এই সাধন-ভক্তি হইতেই মহাধন ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম সাধন করিয়া কেহ লাভ করিতে পারে না, তাহা মানব-হৃদয়-নিহিত নিত্য-সিদ্ধবস্তু। শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনে সেই প্রেমরস উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি দুই প্রকার, বৈধী ও রাগানুগা। স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, অথচ শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনা তাহাই বৈধী অর্থাৎ বিধিসিদ্ধ। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, সাধুদিগের অনুগমন, তীর্থবাস, ভোগত্যাগ, নির্ব্বাহের অতিরিক্ত ভিক্ষা না করা, সেবা ও নামাপরাধবর্জ্জন, অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, সাধুসহবাস, শিষ্যবৃদ্ধি-বর্জ্জন, বহুগ্রন্থা-ভ্যাস-বর্জ্জন, লাভক্ষতিতে সমজ্ঞান, শোকাদির অবশীভূততা, অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, মনোবাক্যে প্রাণীমাত্রের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, অসার গ্রাম্যকথার আলোচনা না করা, ও শ্রবণকীর্ত্তনপরিচর্য্যা-বিজ্ঞপ্তি-আত্মনিবেদন প্রভৃতি সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ। তন্মধ্যে

সমধর্ম্মী ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস অর্থাৎ ভগবানকে সমীপস্থ জ্ঞান করা এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পূজা, এই পাঁচটী প্রধান। কেহ বা এক অঙ্গ কেহ বা বহু অঙ্গ লইয়া সাধন আরম্ভ করেন। এক অঙ্গ সাধনেও অনেক ভক্ত সিদ্ধ হইয়াছেন। অম্বরীষাদি ভক্তগণ বহু অঙ্গের সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে নিষ্ঠা হইলে হৃদয়-নদীতে প্রেমের তরঙ্গ-লহরী ক্রীড়া করিতে থাকে। শাস্ত্রোক্ত এই সকল অঙ্গ সাধনের নাম বৈধী ভক্তি। শাস্ত্র আজ্ঞা মান্য করিয়া কামনাত্যাগ করত যাঁহারা বৈধী ভক্তিতে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা দেবতা ঋষি ও পিত্রাদির ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করেন। * ঘৃণাস্পদ নিষিদ্ধ পাপাচারেও তাঁহাদের মন নিমগ্ন হয় না। ভক্ত মোহ বশতঃ যদি কখনও বিকর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া ভক্তবৎসল হরি ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পবিত্র করেন।

এই ত বৈধীভক্তি সাধনের বিবরণ কহিলাম। রাগানুগা

* "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং।"

ভাগবত—একাদশ স্কন্ধ।

হে রাজন্! যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন; তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, বা পিত্রাদি কাহারও নিকট ঋণী বা কাহারও কিঙ্কর নহেন।

ভক্তির লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। রাগানুগা ভক্তি বিধি-নিষেধনিরপেক্ষ, কেবল রাগময়ী, এইজন্য, বৈধী অপেক্ষা তাহা অতি প্রবলা। বৈধী ভক্তির উদ্দেশ্য এই যে, সাধনে স্বাভাবিক রুচি ও অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রবিধির অধীন হইয়া সাধন করিলে ক্রমে প্রকৃত প্রেমরসের উদ্দীপন হইবে।' কিন্তু স্বাভাবিক রুচিতে অনুরাগ-পথে আত্ম-সমর্পণই রাগানুগত ভক্তি। ইহাতে শুষ্ক বিধির অধীনতা বশতঃ সাধনে ক্লেশ বোধ হয় না, সুতরাং সহজেই পরমে-শ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাধুর্য্যরসের রসিক ব্রজবাসীজনেরই ইহাতে মুখ্য অধিকার। * ইষ্ট-বিষয়ে কি-না অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় গাঢ় তৃষ্ণা ও অনুরাগ ইহার স্বরূপ-লক্ষণ। † আর আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ। রাগানুগত ভক্তিতে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা নাই। ইহার সাধন দুই প্রকার, বাহ্য ও অন্তর।' বাহিরে, সাধকরূপ বহির্দেহে বৈধীভক্তির ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তন করা, এবং অন্তরে ব্রজভাবের কোন সখী সখা বা পিতা মাতাকে আদর্শজ্ঞান করিয়া, সেই আদর্শসাধকের সিদ্ধ দেহ পাইয়াছেন, মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিয়া ভগবৎসেবা করা অন্তরসাধন। যিনি এই স্বাভাবিক ভাবরসে মগ্ন হইয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে অচিরাৎ ভগবৎপ্রীতি ও রতি অঙ্কুরিতা হয়। এবম্বিধ ভক্তেরাই ভগবানকে আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায়

* পরিশিষ্ট দেখ।

† ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব বিভাগ।

উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী ও ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় জ্ঞান করিয়া এইরূপে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং কালচক্র হইতে তাঁহাদের কোন আশঙ্কা নাই। *

"রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগ নামে ॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান ॥
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ।

* ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ ২৫শে অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

প্রয়োজন তত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, হে সনাতন! বেদাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য সম্বন্ধ, ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, এবং তাঁহাতে বিশুদ্ধ সেবাময়ী প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন। সম্বন্ধ ও অভিধেয় ইতিপূর্ব্বে ব্যখ্যা করা হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রের প্রয়োজনস্বরূপ ভক্তিফল প্রেমের বিষয় অতঃপর বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তিরসের জ্ঞান লাভ হইবে। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় রতি হইলেই তাহা প্রেমনামে অভিহিত হয়।* 'নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে,

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপগোস্বামী ভাব ও প্রেমের এই লক্ষণ করিয়াছেন।—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাপ্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

নির্ম্মল সত্ত্বগুণের দ্বারা বিশেষীকৃত আত্মাতে প্রেমসূর্য্যকিরণ সাম্যভাব ধারণ করিলে এবং রুচি প্রভাবে সাধকের চিত্ত মসৃণ হইলে তাহার নাম ভাব বলা যায়।

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক্ প্রকারে মসৃণিত অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃত হয়, যাহা 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিত' অর্থাৎ অতিমাত্র মমতাযুক্ত এবং যাহা 'সান্দ্রাত্মা' কি-না অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেমা (প্রেম) বলিয়া থাকেন।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ ॥"

অন্যান্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ভগবানে অতিশয় প্রেমযুক্ত মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ ভক্তি বলিয়াছেন। * ভাগ্যক্রমে যদি কোন জীবের ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই শ্রদ্ধাবান মানব সাধু সজ্জনের সঙ্গ লাভ করেন। তৎপরে সাধনারম্ভ, অর্থাৎ সাধুসঙ্গের গুণে ভগবানের নামমাধুর্য্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে মতি হয়। এইরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অসৎক্রিয়া কাপট্যাদি অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে ভগবৎ মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে, এবং রুচি হইতে ক্রমে ভগবানে প্রচুর আসক্তি উপস্থিত হয়। এই আসক্তি হইতে চিত্তভূমিতে কৃষ্ণরতি অঙ্কুরিতা হয়। এই কৃষ্ণরতি গাঢ় হইলে প্রেম বলা যায়। এই সর্ব্বানন্দধাম প্রেমই সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বরূপ। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির হৃদয়ে এই প্রেমাঙ্কুর উদ্ভূত হয়, ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে তাঁহার জীবনে এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ক্ষমাশীল হয়েন; প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁহার ক্ষোভ বোধ হয় না; শ্রীহরির সম্বন্ধ ব্যতীত বৃথা কালক্ষয় তিনি বিষতুল্য জ্ঞান করেণ। ভুক্তি, সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়লালসা তাঁহার হৃদয়ে আর প্রতিভাত হয় না। ভক্ত সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে

* ভক্তিমীমাংসাসূত্রকার শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ।২। অর্থাৎ ভগবানে পরম অনুরাগের নাম ভক্তি।

অতিহীন জ্ঞান করেন, অহংকারের লেশমাত্রও তাঁহার জীবনে থাকিতে পারে না। ভগবৎকৃপার প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস। হরিগুণানুকীর্ত্তন ও হরিনামসুধাপান করিবার জন্য তিনি সমুৎকণ্ঠিত। যে স্থানে হরিলীলাপ্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানেই তিনি বাস করেন। শ্রীহরিতে রতির এই সকল চিহ্ন ভক্তজীবনে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণ ভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে রত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ লীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণ রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৩শ পরিচ্ছেদ।

হে সনাতন! কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এখন সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। যার চিত্তে এই প্রেম উন্মীলিত হয়, তাহার অন্তরের ভাব কথাবার্ত্তা ব্যবহারাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন না; কেন না প্রেমিক ব্যক্তি প্রাকৃত ভাবের অতীত। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগোদ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি
গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ।" ভাঃ ১১শ স্কন্ধ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করেন। যথা,—প্রেমাস্পদ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্জাত হয়, এবং চিত্ত

দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন নাম উচ্চারণ করেন, কখন গান করেন, কখন বা উন্মাদবৎ নৃত্য করেন। এ প্রকার লোক সকল লোকের বহির্ভূত। এই প্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাবে পরিণত হয়। ইক্ষুরস যেমন ক্রমশঃ গাঢ় ও নির্ম্মল হইয়া মৎস্যণ্ডী (মিছরি) হয়, রতি প্রেমও সেই প্রকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া মধুরাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

অধিকারিভেদে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার রতিভেদ হয়। ইহার মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রেমই এই সকল রসের স্থায়ীভাব। ইহার সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলে প্রেমরসের অপূর্ব্বাস্বাদন হয়। বিভাব অর্থাৎ উদ্দীপনা দ্বিবিধ। আলম্বন ও উদ্দীপন। শ্রীহরিই আলম্বন ও বংশীনিনাদ অর্থাৎ হৃদয়কন্দরে নিরন্তর ভগবানের অজেয় আদেশবাণীই উদ্দীপনা। অনুভাব অর্থাৎ মনের পূর্ণ একাগ্রতা, এবং স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও নির্বেদ হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবের মিলনে প্রেমরস অতি মধুর ও চমৎকারজনক হইয়া থাকে। ইহা লাভ করিতে হইলে নায়ক নায়িকাকে রসের আলম্বন করিতে হয়। পুরুষপ্রধান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক শিরোমণি, আর পরাপ্রকৃতিরূপা শ্রীরাধিকাকে নায়িকা কল্পনা করিয়া যে সকল ভক্ত সাধন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে "সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলভাবসংস্কৃতা রতি উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

হে সনাতন! পঞ্চম পুরুষার্থ * কৃষ্ণপ্রেমধনের বিষয় সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। অভক্তগণ ইহার রসাস্বাদন করিতে অক্ষম, ভক্ত ভিন্ন ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন আর কেহই জানে না। পূর্ব্বে প্রয়াগে অবস্থানকালে তোমার ভ্রাতা শ্রীরূপকে রসতত্ত্বের বিচার করিয়া এই সকল বিষয় আমি শিক্ষা দিয়াছি। সনাতন! তুমি ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর, মথুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর, এবং বৈষ্ণব-আচারের স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া জগতের উপকার কর। শ্রীচৈতন্য এই প্রকারে সনাতন গোস্বামীকে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়া বলিলেন, শুষ্ক-বৈরাগ্য ও শুষ্ক-জ্ঞান বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

"কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥

* এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব হয় রস মিলে এইচারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সবমিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য॥
*** ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী॥
নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
এই মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে পিতা মাতা আশ্রয়ে আলম্বন॥
এই রসাস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণ ভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ২৩শ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর সনাতন গৌরচরণে দীনভাবে নিবেদন করিলেন, আমি নীচজাতি, নীচসেবা করিয়া পামরের অধম হইয়াছি। ব্রহ্মার অগোচর যে সকল গভীর সিদ্ধান্ত আমাকে শিক্ষা দিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাহা আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। পারাবারশূন্য অনন্ত-গম্ভীর সিদ্ধান্তমৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার শক্তি নাই। পঙ্গুকে নাচাইতে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমার মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভরে সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, আমি যাহা কিছু উপদেশ দিলাম, তোমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করুক।

সনাতন পুনর্ব্বার গৌরচরণে নিবেদন করিলেন, শুনিয়াছি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট "আত্মারাম" শ্লোকের আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি পুনর্ব্বার বলেন, শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। চৈতন্য বলিলেন, আমি বাতুল, কখন কি প্রলাপ বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম তাহাই সত্য মনে করিয়াছেন। সহজে আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, তোমার ন্যায় সাধুর সঙ্গগুণে যাহা কিছু মনে হইতেছে, বলিতেছি। এই বলিয়া চৈতন্য মহা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঃ অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণোহরিঃ ॥"*

* যে সকল মুনি আত্মারাম অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মাতে নিরন্তর রমণ

ভাগবতোক্ত এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। এই সকল ব্যাখ্যাতে স্থূলতঃ ভক্তিসাধন ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীহরির সেবা ব্যতীত সকল প্রকার ফলসঙ্কল্প পরিত্যাগ করত মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত কৈতব-প্রধান † জানিয়া শুদ্ধভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা কর্ত্তব্য। ভক্তি বিনা অন্য সাধন অজাগল-স্তনের ন্যায়

করেন, এবং "নিগ্রন্থাঃ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওয়াতে যাঁহারা বিধি-নিষেধরূপ গ্রন্থের বহির্ভূত হইয়াছেন অথবা ক্রোধ-অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি হইতে যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীহরির মধুময় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

† "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং"।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ।

মহামুনিকৃত ভাগবত শাস্ত্রে, নির্ম্মৎসর হিংসাদিরহিত সর্ব্বভূতবৎসল সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় মোক্ষ পর্য্যন্ত ফলাভিসন্ধিরূপ কাপট্যাদি শূন্য পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, "পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।" 'প্রোজ্ঝিত' শব্দে 'প্র' উপসর্গ থাকাতে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত কৈতব বলিয়া বুঝিতে হইবে। "কৈতব" অর্থে ছল, কপটতা। ভক্তিশাস্ত্রে মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রধান কৈতব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

বৃথা। ভক্তিই পরম প্রবল, ভক্তিই সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন। ইহার গন্ধমাত্রে ভোগাভিলাষ, মুক্তিকামনা ও সিদ্ধিসুখ পলায়ন করে। সৎসঙ্গ, ভগবৎসেবা, ভাগবত পাঠ, নামজপ ও ব্রজভূমিতে বাস, এই পঞ্চবিধ সাধনই প্রধান। ইহার মধ্যে কোন একটী স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই সুবুদ্ধি ব্যক্তির শ্রীহরিতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। ভক্তিপ্রভাবে শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণ সকল কামনা ত্যাগ করত হরিপদারবিন্দ আশ্রয় করেন। সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তবে যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় কর্ম্ম-কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সেই সাধক কেবল শ্রীহরির ভজনা করেন। ভাগবতে কথিত হইয়াছে,

"সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং॥"

ভাগবত ১ম স্কন্ধ।

যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি সাধুসঙ্গগুণে বিষয়রূপ দুঃসঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি সাধুমুখে কীর্ত্ত্যমান ভগবানের মনোহর যশোগান একবারমাত্র শ্রবণ করিতে পাইলে আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। হে সনাতন! তোমার পবিত্র সঙ্গগুণে আমার হৃদয়ে এই সকল অর্থ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। সনাতন গৌরমুখে 'আত্মারাম' শ্লোকের বিবিধ তত্ত্বগর্ভ গভীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পুল-

---

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, আদিখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিত হইয়া বলিলেন, ভাগবতের গভীর তত্ত্ব আপনি ব্যতীত আর কে জানে? চৈতন্য বলিলেন, কেন আমার স্তুতি করিতেছ? ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোক প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সনাতন! আমি একজন বাতুল, শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যে সকল প্রলাপোক্তি করিলাম কে তাহা মান্য করিবে? আমার ন্যায় বাতুলেরাই ভাগবতের এবম্বিধ অর্থ বুঝিয়া থাকে।

দশম অধ্যায়।

সনাতনের "বৈষ্ণব-স্মৃতি" প্রণয়ন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ—বৃন্দাবনযাত্রা এবং সুবুদ্ধি-রায়ের সহিত মিলন।

সনাতন বিনয়বচনে চৈতন্যচরণে নিবেদন করিলেন, প্রভু, আমাকে বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু আমি আচারভ্রষ্ট হীনজাতি, সদাচার কিছুই জানি না, আমার দ্বারা কথনই ইহা সম্পন্ন হইবে না। আপনি এ বিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। চৈতন্য বলিলেন, সনাতন, ভগবানের কৃপাতে তোমার অন্তরে সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। তথাপি সংক্ষেপে সূত্ররূপে কিছু বলিতেছি। প্রথমতঃ গুরু-আশ্রয়, গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরু

শিষ্যের পরীক্ষা, মন্ত্রের বিচার, মন্ত্রের অধিকারী নির্ণয় ও দীক্ষা বিষয়ে লিখিবে। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য-শৌচ-আচমন চন্দন-মাল্যধারণ ও পঞ্চাশৎ উপচারে শ্রীহরির পূজা, নাম-মহিমা, নামাপরাধবর্জ্জন, বৈষ্ণব-লক্ষণ, বৈষ্ণবনিন্দাপরিবর্জ্জন, অনিবেদিতত্যাগ, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গত্যাগ প্রভৃতি সাধারণ সদাচার ও বৈষ্ণবাচার সকল পুরাণবচন প্রমাণ দিয়া লিপিবদ্ধ করিবে। * আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম, তুমি

---

* সমাজ-প্রচলিত ফলশ্রুতিপূর্ণ বিবিধ কাম্যকর্ম্মের যাজনা বৈষ্ণব ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং ভক্তিপথাবলম্বী সংসার-কামনা-বিহীন বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত পৃথক স্মৃতিশাস্ত্র আবশ্যক হইয়াছিল। যে সকল বৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসানুরূপ গৃহ্য-অনুষ্ঠান সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রেম-ভক্তি-প্রভাবে জাতিভেদাদি লৌকিকাচার চৈতন্যানুচরদিগের মধ্যে অনেক পরিমাণে শিথিল হইতেছিল। এই সকল কারণে বৈষ্ণবেরা ক্রমশঃই পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছিলেন। এই সকল ভেকাশ্রিত অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত চৈতন্যদেব সনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রণয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবগণ সাধারণ হিন্দুসমাজ-প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ অগ্রাহ্য করিয়া প্রেমভক্তিমার্গ অবলম্বন করায় শাক্ত ও হিন্দুসমাজভুক্ত অন্যান্য সাম্প্রদায়িকগণ বৈষ্ণবদিগকে ক্রিয়াহীন পতিত বলিয়া ঘৃণা করিতেন। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এ দেশের একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ। এই ঘৃণা বিদ্বেষ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়াস্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। বৈষ্ণবগণ গোঁড়ামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শাক্তের ব্যবহৃত পূজার উপকরণ বিল্বপত্রকে তেফড়কার পাতা ও জবাপুষ্পকে ওড়ফুল বলিতেন। শাক্তরাও কম নহেন, তাঁহারা নিরীহ বৈষ্ণবগণকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ উপহাস করিয়া অপদস্থ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেন। বৈষ্ণবগণের সমাজ বহির্ভূত

যখন লিখিতে আরম্ভ করিবে, ভগবান সকল কথা তোমার হৃদয়ে প্রকাশ করিবেন। এই প্রকারে ভক্তবর শ্রীগৌরাঙ্গ

আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদের শিথিলতা ও শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত হয়। কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হওয়ায় ও অনেকানেক শাক্তমতাবলম্বী গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, এই বিবাদ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। গোস্বামীগণ নিতান্ত ইতর জাতিকেও মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিতেন বলিয়া হিন্দু সমাজের হেয় ছিলেন। এই অসম্মান দূর করিবার জন্য তাঁহারা কুলীনদিগকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ পরস্পর আদান-প্রদানরূপ বৈবাহিকসম্বন্ধে সম্বন্ধ হওয়ায় বিদ্বেষ ভাব বিদুরিত হয়, এবং বৈষ্ণবগণ সাধারণ হিন্দুসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। গোস্বামীগণ অন্তরে যাগযজ্ঞ কাম্যকর্ম্মের বিরোধী হইয়াও সমাজরক্ষার জন্য বাহিরে তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময় হইতেই গোস্বামী ও অন্যান্য গৃহস্থবৈষ্ণবগণ সমাজভয়ে বৈষ্ণব পঙ্গতে প্রচ্ছন্নভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজে শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন সঙ্ঘটিত হয়, এবং বৈষ্ণবভাব অনেক পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। যাহারা সমাজ ত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও তাহাদেরই জন্য সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে বৈষ্ণবের আচার প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে আর কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বদ্ধ নাই। স্মার্ত্ত মতের ন্যায় হরিভক্তিবিলাসের মত "গোস্বামীমত" বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এই বৈষ্ণবস্মৃতি স্বরূপ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সনাতন গোস্বামী প্রণীত।

"হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড।

কিন্তু সচরাচর যে হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার রচয়িতা গোপালভট্ট গোস্বামী।

সনাতনকে দুই মাস ধরিয়া প্রেমভক্তিরসের সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ দিলেন। কবিকর্ণপূর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকে সনাতনের প্রতি গৌরচন্দ্রের এই সকল অনুগ্রহবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন,—

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং॥"

গৌড় রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ শ্রীরূপাগ্রজ এই সনাতন। ইনি মহাসমৃদ্ধিলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া তরুণী-বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈবাল-সমাচ্ছন্ন মহাসরোবরের ন্যায় ইঁহার হৃদয় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, কিন্তু বাহিরে মহা বৈরাগীর বেশ; ইনি ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতিপ্রদ।

অনন্তর চৈতন্যদেব নীরস-কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহলময় কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে ভক্তিপ্রসঙ্গ করিয়া নীলাদ্রি গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সনাতনকে বলিলেন, তোমার দুই ভাই শ্রীরূপ ও বল্লভ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তুমি তথায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হও। কন্থাকরঙ্গধারী আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ তথায় গমন করিলে যত্ন করিও। এই বলিয়া গৌরসুন্দর সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া নীলাচলে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। মহাপ্রভুর বিরহ-চিন্তা সনাতনের অসহ্য হইল, কাতর স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,

"দূত কহে সনাতন প্রভুকৃপা পাঞা।
পড়িয়া কান্দেন প্রভুর চরণ ধরিয়া॥
আজ্ঞা হয় চলি আমি শ্রীচরণ সহ।
সহিতে নারিব আমি তোমার বিরহ॥
প্রভু কহে আগে যাঞা দেখ বৃন্দাবন।
পাছে নীলাচলে মোর পাবে দরশন॥
বহু যত্নে সনাতনে মথুরা পাঠাঞা।
নীলাচল যাত্রা কৈলা আনন্দিত হঞা॥"

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, নবম অঙ্ক।

গৌরচন্দ্র রজনীযোগে নীলাচল উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্য তাঁহার অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, তিনি সকলকে স্নেহ বচনে প্রবোধ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, আমি ঝারিখণ্ডের আরণ্যপথে একাকী গমন করিব। যার ইচ্ছা হয়, ইহার পর আসিও।

তদনন্তর সনাতন রাজপথ ধরিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সনাতনের অনুসন্ধানার্থ রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাপথে কাশীযাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎ হইল না। সনাতন মথুরাতে উপনীত হইলে ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সুবুদ্ধি রায় পরম সমাদরে সনাতনকে গ্রহণ করিলেন। এখানে সুবুদ্ধি রায়ের বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। এই সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের একজন ধনবান ভূম্যধিকারী ছিলেন। সেই সময়ে সৈয়েদ হুসেন সাহা তাঁহার কর্ম্মচারী

ছিলেন। দীর্ঘিকাখনন কার্য্যে সৈয়দ হুসেনের কোন অপরাধ পাইয়া সুবুদ্ধি তাঁহাকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। কালের বিচিত্র গতি! কিছুদিন পরে হুসেন সাহা গৌড়ের রাজা হয়েন। হুসেন রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও পুরাতন প্রভুর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তদীয় ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রী স্বামীর প্রতি সুবুদ্ধি রায়ের কশাঘাত বিস্মৃত হয় নাই। অঙ্গের আঘাতচিহ্ন দেখাইয়া উক্ত নারী সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত স্বামীকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। হুসেন কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতে সেই নারী বলিল, তবে উহার জাতি মারিয়া দাও। হুসেন বলিলেন, জাতি নষ্ট হইলে রায় বাঁচিবেন না। শেষে স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে হুসেন সুবুদ্ধি রায়ের মুখে জল ছিটাইয়া দিলেন। জাতিভ্রষ্ট সুবুদ্ধি রায় ঘৃণা, লজ্জা ও নির্ব্বেদে ম্রিয়মাণ হইয়া বিষয় বিভব পরিত্যাগ করত বারাণসীতীর্থে উপনীত হইয়া তত্রত্য পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্তবিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তপ্ত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিলেন। শুষ্ক-কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী পণ্ডিতদিগের উপদেশে ঘৃত ভক্ষণে আত্মহত্যা করা সুবুদ্ধি রায় সঙ্গত মনে করিলেন না। এই সময়ে বারাণসীতে চৈতন্যচন্দ্র বাস করিতেছিলেন। ভক্তগোষ্ঠীর ভক্তিপ্রসঙ্গ ও প্রেমবিগলিত হরিনামসংকীর্ত্তনের প্রবল প্লাবনে কাশীর ন্যায় নীরস স্থানও সরসভাব ধারণ করিয়াছিল। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলেন। চৈতন্য বলিলেন ;—

"——ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

হে রায়! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন কর। এক নামে তোমার পাপদোষ নষ্ট হইবে, দ্বিতীয় নামে হরিচরণারবিন্দ লাভ করিবে, এবং তৃতীয় নামে কৃষ্ণসহবাসে স্থান পাইবে, ইহাই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি। ভক্তবর চৈতন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করত রায় অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য পরিভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে আসি-লেন। এখানে আসিয়া সুবুদ্ধি রায় উৎকট বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিলেন। শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মথুরার বাজারে বিক্রয় করেন, এক এক বোঝা কাঠ বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় পয়সা মাত্র উপার্জ্জন হয়। তন্মধ্যে আপনি এক পয়সার চণক চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, অবশিষ্ট পয়সা দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণব দেখিতে পাইলে ভোজন করান এবং বাঙ্গালি দেখিলে দধিভাত খাওয়ান ও তৈল মাখান। কিছু দিন পরে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। পরে সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সুবুদ্ধি পরমানন্দে মগ্ন হই-লেন। পরম বৈরাগী সনাতন সুবুদ্ধির স্নেহ যত্ন ভাল

বাসিতেন না, তিনি একাকী প্রতি বৃক্ষমূলে ও প্রতিদিন নব নব কুঞ্জে দীন ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক বনে বনে পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষাবস্থায় রূপ ও সনাতন দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। নিরন্তর হরিনামকীর্ত্তন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিন কাটাইতেন। চৈতন্যানুবর্ত্তী সাধকদিগের মধ্যে ইহাঁরা জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এবং ইহাঁরাই বিবিধ গ্রন্থ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা করেন। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত বৈষ্ণব সাধকগণকে চৈতন্য ও তাঁহার পারিষদগণ রূপ সনাতনের বিষয় সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। ভক্তগণ বলিতেন, "তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক এক বৃক্ষমূলে এক এক রাত্রি শয়ন করেন, কখন বা বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কখন বা দ্বারে দ্বারে মাধুকরী, কখন বা কেবল শুষ্ক রুটী ও চণক ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। পরিধানে ছিন্ন বহির্ব্বাস মাত্র। হরিনাম সংকীর্ত্তন ও হরিনাম প্রসঙ্গে অষ্টপ্রহরই মগ্ন হইয়া থাকেন, চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা যান, তাহাও সকল দিন ঘটে না। শ্রীচৈতন্যের পবিত্র চরিত্রচিন্তন, বৃক্ষতলে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থানুশীলন ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা কালাতিপাত করেন।" ভক্তগণের মুখে রূপ সনাতনের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য ও শিষ্যগণ পরমানন্দে মগ্ন হইতেন।

"মহাপ্রভুর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র ॥

কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চাণা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়॥”

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

“তবে চলি গেলা গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম॥
মূর্ত্তিমান্ মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর।
শাস্ত্রান্তগা পৃথিবীর মধ্যে একধীর॥

প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥
বৃক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥"
ভক্তমাল গ্রন্থ, দ্বিতীয়মালা।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীরূপের নীলাদ্রি গমন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সনাতন গোস্বামী চৈতন্য প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া বৃন্দাবনধামে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের উদ্দেশে গঙ্গাপথে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রয়াগে উত্তীর্ণ হইয়া সনাতনের বৃন্দাবন গমন সংবাদ অবগত হইলেন। তৎপরে কাশীতে উপনীত হইয়া তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সনাতনের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ ও প্রেমভক্তিতত্ত্ব শিক্ষাদানের বিষয় অবগত হইয়া এবং কাশীবাসী দণ্ডী পরমহংসদিগের মুখে চৈতন্য প্রভুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া রূপ অতিমাত্র আনন্দ লাভ করিলেন। কাশীতে কিছুদিন অবস্থিতি করত তাঁহারা গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনধামে অবস্থান কালে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নাটকের

কিয়দংশ অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক বৃন্দাবনেই লিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে পথে যাইতে যাইতে নাটকের ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন ও তাহা কড়চা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলে অকস্মাৎ জ্বরবিকারে অনুপমের পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের ভক্তগণ এই সংবাদ পাইবা-মাত্র তথায় গমন করিতে লাগিলেন। রূপও প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অনুপমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সমাধা করিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। তিনি নবদ্বীপে আগমন করিয়া দেখিলেন, ভক্তবৃন্দ চলিয়া গিয়াছেন। রূপ কালবিলম্ব না করিয়া একাকী নীলগিরি গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

গৌড় হইতে রূপ গোস্বামী নীলাচল আসিবার কালে উড়িষ্যাদেশে সত্যভামাপুর নামক কোন গ্রামে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন। এইখানে তিনি নিশাকালে স্বপ্ন দেখেন,—যেন এক দিব্যরূপধারিণী রমণী আসিয়া বলিলেন, "আমার নাটক পৃথকরূপে রচনা করিবে।" স্বপ্নের কথা মনে মনে বিচার করিয়া রূপ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা ও দ্বারকালীলা একত্রে লিখিবার সংকল্প করিয়াছি, এই জন্য সত্যভামা দুই লীলা স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনন্তর রূপ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমাগত হইয়া হরিদাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। হরিদাস নীচ-জাতি যবন, এইজন্য জগন্নাথপুরীতে থাকিতেন না, শ্রীক্ষেত্রের

অনতিদূরে নির্জ্জন স্থানে একটী সামান্য কুটীরে হরিনামরসে নিমগ্ন থাকিতেন।* চৈতন্যদেব প্রতিদিন হরিদাসের কুটীরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে মগ্ন হইতেন। রূপ যে দিন হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, সে দিন শ্রীচৈতন্য তথায় আগমন করিলে রূপ ও হরিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বোধ হয় চৈতন্য রূপকে প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই। হরিদাস বলিলেন, রূপ প্রণাম করিতেছেন। রূপের নাম শুনিয়া চৈতন্যদেব মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সনাতনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে রূপ বলিলেন, আমি গঙ্গাতীরের পথে আসিয়াছি, প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম তিনি রাজপথে বৃন্দা-

* হরিদাস ও রূপ সনাতন আপনাদিগকে নীচজাতি জ্ঞান করিয়া জগন্নাথমন্দিরে গমন করিতেন না, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতেন। সনাতন ও রূপ নীলাচলে গিয়া হরিদাসের আশ্রমেই বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যিনি যখন নীলাচলে থাকিতেন, চৈতন্যদেব প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাধন ভজন প্রেমালাপে কিছুক্ষণ যাপন করিতেন। ফলতঃ রূপ সনাতন যে যবনভাবাপন্ন ছিলেন, এই ঘটনায় তাহা আরও বিস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে এই নাযান তিনজন॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

বন গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। অনুপমের গঙ্গালাভসংবাদ রূপ নিবেদন করিলে চৈতন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রূপকে হরিদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া চৈতন্যদেব সে দিনের মত বিদায় হইলেন। পরদিনে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন ও রূপ গোস্বামীর সঙ্গে নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ও উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রূপ বিনয়ে অবনত হইয়া ভক্তগণের চরণবন্দনা করিলেন। রূপের নিরভিমান গভীর জ্ঞান, বিনয়, সৌজন্য ও ভক্তিভাব সন্দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে চৈতন্য বলিলেন,—

"—রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দুঁহার কৃপায় ইহাঁর তৈছে হউক শক্তি।
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরস ভক্তি॥"

রূপ, হরিদাসের সঙ্গে নিভৃতে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। চৈতন্য প্রতিদিন আসিয়া কিছুক্ষণ ইষ্টালাপ করিয়া যান। ক্রমে জগন্নাথের রথযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। রূপ জগন্নাথবিগ্রহ ও ভক্তগণের নৃত্যকীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। রথ বাহির হইলে, গৌরসুন্দর মহাভাবে বিভোর হইয়া একটী সামান্য আদিরসের শ্লোক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া রথের অগ্রে নাচিতে লাগিলেন। স্বরূপদামোদর ব্যতীত এই শ্লোকের ভাবার্থ আর কেহই জানিত না। এই শ্লোকের সঙ্গে, প্রভুর হৃদয়ের কি সম্বন্ধ, কেনই বা তিনি বারম্বার ইহা উচ্চারণ করিতেছেন,

তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। শ্লোকটী এই ঃ—

"যঃ কৌমার হরঃ সএবহি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলা বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥"

কোন নায়িকা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, যিনি কৌমারবয়সে আমার মনোহরণ করিয়াছিলেন, তিনি এখনও আমার কান্ত রহিয়াছেন; পূর্ব্বের ন্যায় মধুযামিনীও বর্ত্তমান, প্রস্ফুটিত মালতী কুসুমের সুরভিসংপৃক্ত পরমসুখ-দায়ক সেই বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে, এবং সেই আমিও রহিয়াছি; তথাচ প্রমোদলীলাবিষয়ে রেবাতীরবর্ত্তী সেই বেতসীকুঞ্জ মনে করিয়া আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

রাধাকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে মিলনাভিনয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তৎভাবানুবিদ্ধহৃদয়ে চৈতন্যদেব এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকের অনুরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিলেন।

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ মিলিতা হইয়া সখীকে বলিতেছেন, হে সহচরি! বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ

এই প্রভাসযজ্ঞস্থলে উপস্থিত, এবং আমিও এখানে তাঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছি, আমাদের পরস্পর মিলনজনিত সুখও সেইরূপ। তথাপি ব্রজধামের নিকুঞ্জকাননোত্থিত ক্রীড়াশীল মধুরমুরলীরবে যে যমুনাপুলিন আন্দোলিত হইত, তাহার জন্য আমার মন সমুৎসুক হইতেছে।

রথ ভাঙ্গিয়া গেলে সকলে আপন আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রূপ শ্লোকটী তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসের আশ্রমকুটীরে আসিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করিবামাত্র তাল-পত্রে লিখিত সেই শ্লোক দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রূপ স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিলেন এবং প্রাঙ্গণ হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। চৈতন্য প্রভু আদর করিয়া রূপের পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার হৃদয়ের গূঢ় ভাব তুমি কিরূপে টের পাইলে? স্বরূপকে এই শ্লোক দেখাইয়া বলিলেন, "বলদেখি, রূপ আমার মনের কথা কেমন করিয়া জানিল?" স্বরূপ উত্তর করিলেন, তোমার কৃপা না হইলে কে তাহা জানিতে পারে? গৌর বলিলেন, নিগূঢ় রসের মীমাংসা বিষয়ে রূপ যে যোগ্যপাত্র, প্রয়াগে মিলনকালে তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। এই জন্য ইহাঁকে শক্তিসঞ্চার করিয়া অনেক বিষয় উপদেশ দিয়াছি। তুমিও ইহাঁকে রসশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া দিও।

এই সময়ে রূপ নাটক রচনাতে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক ভাবে লিখিবার কথা বোধ হয় চৈতন্য অবগত হইয়াছিলেন; এক দিন গৌর

বলিলেন,

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু নাযান কাঁহাতে॥"*

* বৈষ্ণবদিগের মতে কৃষ্ণ দুইজন। যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ। বৈষ্ণবেরা গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই মাধুর্য্যভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নন্দনন্দন কৃষ্ণ ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া কখন অন্যত্রে গমন করেন না। প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা লঘুভাগবতামৃতধৃত এই যামল বচন উল্লেখ করেন।

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

বৈষ্ণব টীকাকার বলেন, "যঃ কৃষ্ণো যদুসম্ভূতঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য মথুরায়াং গচ্ছতি। যো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ক্বচিৎ ন গচ্ছত্যেব।" এই কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন যে, যৎকালে বসুদেব কংসের কারাগার হইতে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার ক্রোড় হইতে কৃষ্ণ যমুনাসলিলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। বসুদেব যাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, তিনি শঙ্খচক্রাদিধারী নহেন, দ্বিভুজমুরলীধরমূর্ত্তি, নন্দনন্দন কৃষ্ণ; আর দেবকীগর্ভজাত বাসুদেবকৃষ্ণ যমুনাগত হইয়া রহিলেন। পরে যখন অক্রূর ব্রজ হইতে কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আইসেন, তখন যমুনার জলে স্নান করিবার সময় তিনি জলের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। এই সময়ে গোপেন্দ্রনন্দন রথ হইতে পুনরায় যমুনানীরে গমন করেন ও পূর্ব্বোক্ত যমুনাগত বাসুদেব কৃষ্ণ রথে উত্থিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটী আখ্যায়িকা এই যে, যশোদা একটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব স্বীয় পুত্র সহ যশোদা গৃহে প্রবেশ করিয়া আত্মতনয়সদৃশ যশোদাতনয়কে ক্রোড়ে লইবামাত্র, মেঘে যেমন বিদ্যুৎ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ নন্দসুতে বসুদেবসুত বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

দুই লীলা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিবেন, রূপের এই ইচ্ছা ছিল, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের সম্মতি পাইয়া উৎসাহিত হইলেন,

---

দুই কৃষ্ণের পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ এই সকল আধুনিক আখ্যায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মতে এই দ্বিভুজ-মুরলীধর পীতাম্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। গোলোকধামে গোপগোপী-দিগের সঙ্গে তাঁহার যে মাধুর্য্যলীলা, তাহা অনাদি অন্তহীন ও নিত্য। অদ্যাবধি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপুরে সেই নিত্যলীলা তরঙ্গ অবিশ্রাম তরঙ্গায়িত হইতেছে। প্রপঞ্চময় বৃন্দাবন-লীলা এই অপ্রকট নিত্যলীলার বাহ্য বিকাশ মাত্র। এই মাধুর্য্যময়ী নরলীলা প্রকটন জন্য স্বয়ং ভগবানের যে অবতরণ, তাহাই পূর্ণা-বতার। তদ্ব্যতীত অসুর-সংহার ও যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নিমিত্ত যুগাবতার এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-সাধনার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে শ্রীহরির গুণাবতার প্রভৃতি উক্ত পূর্ণ পুরুষের অংশ শক্তি মাত্র। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের অসংখ্য শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টিলীলা রক্ষা করিতেছে, সুতরাং অবতারও অসংখ্য। কিন্তু লোক সকলকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়া নির্ম্মল প্রেমের অধিকারী করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"

(ভাগবত।)

ভগবান ভূত সকলকে কৃপাদানের জন্য লীলাচ্ছলে ইহলোকে দেহ ধারণ করেন, তিনি মানব দেহ ধারণ করিয়া মানবোচিত লীলা করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করত তাঁহাতে রত হয়। এই পূর্ণাবতাররূপ নরলীলা প্রকটনজন্য ভগবান স্বতন্ত্র দেহ ধারণ না করিয়া, যুগাবতার কালে তদীয় অংশস্বরূপ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে সেই দেহে আবির্ভূত হইয়া ব্রজধামে প্রেমলীলা প্রকটিত করিয়া-ছিলেন।' অপিচ ভগবানের পূর্ণাবতার কালে অংশাবতার যুগাবতার প্রভৃতি সকলেই সেই বিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়। পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের

এবং পৃথক পৃথক নান্দীপ্রস্তাবনা লিখিয়া লীলাভেদে বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি নাটক লিখিতে লাগিলেন। রূপ গোস্বামী কেবল বিষয়বিরাগী হরিভক্ত সাধু ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার ভাবমাধুর্য্য, পদলালিত্য ও স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অতি উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

একদিন হরিদাসের আশ্রমে বসিয়া রূপ নাটক লিখিতে-ছেন, এমন সময়ে চৈতন্যদেব সেইখানে আসিয়া উপস্থিত

পূর্ণাবতার সময়ে অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ভূভারহরণ নিমিত্ত যুগাবতারের কাল উপস্থিত হওয়ায় উভয়ে একত্রে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজলীলা প্রকটন ও যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই জন্য বৈষ্ণবমতে যিনি যুগাবতার, তিনি যদুবংশোদ্ভব ও ভগ-বানের অংশ; আর চিদ্বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলাবিহারী স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন কৃষ্ণ প্রাকৃত বৃন্দাবনে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের নির্ম্মল ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নাই। যদুকুলোদ্ভূত অংশাবতার কৃষ্ণই বৃন্দাবন হইতে মথুরা গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে বৈষ্ণবেরা দুই কৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামী প্রভৃতি দুই কৃষ্ণের ঈদৃশ পার্থক্য স্বীকার না করিয়া কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, মাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজে তিনি পূর্ণতম, মথুরা ও দ্বারকাদিধামে পূর্ণতর ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভাগ-বতের টীকায় বলিয়াছেন, ব্রজে যিনি গোপ, তিনিই পূর্ণতম ঈশ্বর কৃষ্ণ, মথুরা ও দ্বারকাপুরে তিনি পূর্ণতর এবং যিনি ক্ষত্রিয়রূপে যুদ্ধবিগ্রহ স্থলে প্রকট, তিনি পূর্ণ কথিত হইয়া থাকেন।

হইলেন, এবং ‘কি পুঁথি লিখিতেছ?’ বলিয়া লিখিত পুস্তকের একটী পাতা টানিয়া লইলেন। প্রথমতঃ রূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা করিয়া চৈতন্য বিদগ্ধমাধবের সেই শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন।

“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥”

‘কৃষ্ণ’ এই দুইটী বর্ণ যে কি পরিমাণ অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা জানিনা। যখন ইহা রসনাতে নৃত্য করিতে থাকে, তখন আরও বহু রসনা লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা জন্মে, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবৃষ্ট হইলে সমুদায় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার ইহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। এই মাধুর্য্য-রস-সিঞ্চিত হরিনাম-মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক অপূর্ব্ব শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমরসময় গৌরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। হরিদাস উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, শাস্ত্র ও সাধুমুখে নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এমন সুধামাখা নাম-মহিমা কখনও শুনি নাই।

আর এক দিন গৌরসুন্দর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্ত পণ্ডিতগণে পরিবৃত হইয়া রূপের সন্নিধানে আসিলেন। গৌরের মুখে রূপের প্রশংসা আর ধরে না, সমস্ত পথ ভক্তগণ সমীপে রূপের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দসহ প্রভুকে দেখিয়া রূপ ও হরি-

দাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে পিঁড়ার পরে বসাইলেন এবং আপনারা ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন। চৈতন্য প্রভু বলিলেন, রূপ! সেই অমৃতময় শ্লোক আবার পড়। রূপ গোসাঞি বিনয়ে অধোবদন, লজ্জাতে পড়িতে না পারিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। তখন স্বরূপ গোসাঞি, চৈতন্যের হৃদয়ানুবাদের সেই কবিতা ভক্তগণকে শুনাইলে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এইবার শ্রীচৈতন্য রূপকে নাটকের নাম মাহাত্ম্যের শ্লোকটী পড়িতে আদেশ করিলেন। রূপ গৌরের পুনঃপুনঃ অনুরোধে বিদগ্ধমাধব নাটকের সেই শ্লোক আবার পাঠ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্যযুক্ত কবিত্ব-রসপূর্ণ শ্লোকের রসাস্বাদন করিয়া রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণ আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, এমন মধুময় নামমহিমা আমরা কখন শুনি নাই। রায় রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥"

স্বরূপ গোস্বামী রামানন্দকে নাটকের পরিচয় অবগত করিলে, রায়ের অনুরোধে রূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিদগ্ধমাধবের নান্দীশ্লোক পাঠ করা হইল।—

"সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ।"

যাহাতে সুধাংশুর সুধামাধুর্য্যশালিতার গৌরব দমিত হইয়াছে, এবং যাহা রাধাদির প্রণয়রূপ কর্পূরসংযোগে সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে, সেই হরিলীলা-শিখরিণী অর্থাৎ হরিলীলারূপমধুরাস্বাদযুক্ত পাণীয় তোমার সন্তাপ-বর্দ্ধক অতি দুর্গম সংসার-রূপ-পথ-পর্য্যটন-জনিত তৃষা নিবারণ করুক। এইরূপে প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিকার চেষ্টা, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ ইত্যাদি যে রসের যেরূপ প্রেমরসাভিষিক্ত কবিত্বময় শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, রূপ গোস্বামী নাটকের মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া ভক্তগণকে তাহা শুনাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। পূর্ব্বকথিত দুইখানি নাটকের নান্দীতে রূপ গোস্বামী ইষ্টদেব বন্দনার যে শ্লোক রচনা করেন, চৈতন্যের ভয়ে তিনি তাহা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। এই দুই শ্লোকে আপন ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যের বর্ণনাচ্ছলে চৈতন্যাবতারের আভাস প্রদান করা হইয়াছিল। ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণনা ত দূরের কথা, শ্রীচৈতন্য আপনার সামান্য প্রশংসাও সহ্য করিতে পারিতেন না। তৃণ হইতে নীচ ও নিরভিমান হইয়া হরিনাম করাই চৈতন্যের ধর্ম্ম। কেহ তাঁহার অন্যায় প্রশংসা করিলে তিনি বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া মহা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। এই কারণে উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিতে রূপ গোস্বামী নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। রূপের লজ্জা ও সংকোচ দেখিয়া চৈতন্য বলিলেন, বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থ শুনাইবে ইহাতে আর লজ্জা কি, শ্লোক পাঠ কর।

"রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে॥"

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরের আদেশে রূপ সলজ্জভাবে এই দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

বিদগ্ধমাধব।

যে উন্নতোজ্জ্বল মধুর রস জগতে কখন অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় ভক্তিসম্পদ প্রদান করিবার জন্য যিনি করুণা করিয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন; যাঁহার দেহদ্যুতি কনককান্তি হইতেও অতি উজ্জ্বল শোভাযুক্ত, সেই শচীনন্দন হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

"নিজপ্রণয়িতা সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥"

ললিতমাধব।

যিনি ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রেমরসামৃত

বহুল পরিমাণে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি দ্বিজকুলাধিরাজ এই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি অজ্ঞানান্ধকার সমূহ বিনাশ করিতেছেন, সেই জগন্মোহন শচীনন্দন শশী আমার অনির্ব্বচনীয় সুখ বিধান করুন।

শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর নিজের অতিস্তুতি শ্রবণ করিয়া রাগান্বিত হইয়া রূপকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রামানন্দ বলিলেন, রূপের বাক্য সহজেই অমৃতরসে পরিপূর্ণ, তোমার স্তুতিরূপ-কর্পূর বিন্দুর সংযোগে তাহা আরও সৌগন্ধময় হইয়াছে। চৈতন্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এই সকল উপহাসকর লজ্জাজনক কথা শুনিয়া তুমি উল্লসিত হইতেছ ইহাই অতি আশ্চর্য্য! রায় রামানন্দ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে অভীষ্ট দেবের স্তুতি করা দোষাবহ নহে, ইহা শ্রবণ করিয়া লোকের সুখ হইয়া থাকে।

"তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল॥
... ...
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস॥

রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর রামানন্দ রূপের কবিত্বের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। রূপ বিনীত ভাবে বলিলেন, কোথায় সূর্য্যসম আপনি, আর কোথায় আমি ক্ষুদ্র খদ্যোত সদৃশ; আপনার সম্মুখে আমার মুখব্যাদান করা মহা ধৃষ্টতা। রূপ গোস্বামীর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রায় প্রভুকে বলিলেন, "সহস্র বদনে রূপের কবিত্বের সুখ্যাতি করিতে হয়, অমৃত ধারার ন্যায় ইহাতে মধুর প্রেমপারিপাট্য অদ্ভুতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবির কাব্য রচনা ও ধানুকীর শস্ত্র নিক্ষেপ বৃথা, যদি তাহা পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার মাথা ঘুরাইয়া না দেয়। রূপের কাব্য শুনিয়া চিত্ত কর্ণ আনন্দে ঘূর্ণিত হয়।" চৈতন্য বলিলেন; "ইহাঁর সালঙ্কার কাব্য অতি মধুর প্রসঙ্গ, এ প্রকার কবিত্ব ব্যতীত মাধুর্য্যরস প্রচার হওয়া অসম্ভব। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া রূপকে এই বর দাও, যেন ইনি প্রেমরসময় ব্রজলীলা নিরন্তর প্রচার করিতে পারেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। দীনতা, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য তাঁহাতেই সম্যকরূপে স্থিতি করিতেছে। এই দুই ভাইকে আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলাম।" রূপের প্রতি প্রভুর স্নেহ ও কৃপা দেখিয়া ভক্তমণ্ডলী সুখী হইলেন এবং প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে সকলে রূপকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপও সকলের পাদবন্দনা করিলেন। বর্ষা চারি মাস অতিবাহিত

হইলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। চৈতন্যদেব যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ভক্তিরস-পিপাসু গৌরগতপ্রাণ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমসাগর গৌরের প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে নীলাদ্রিতে আসিতেন। অদ্বৈত প্রভৃতি নীলাচল পরিত্যাগ করিলে রূপ গোস্বামী হরিদাসের কুটীরে থাকিয়া উভয়ে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে অতি আনন্দ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হরিদাস একদিন বলিলেন,তোমার মহা সৌভাগ্য, তুমি যে সব তত্ত্ব বর্ণনা করিলে, তাহা তুমি ভিন্ন আর কে জানে বল! রূপ বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, প্রভু হৃদয়ে যা প্রেরণা করেন, তাই বলিয়া থাকি। দোলযাত্রা পর্য্যন্ত রূপ নীলাচলে অবস্থান করেন। তৎপরে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ করিয়া ভক্তিরস প্রচার কর, এবং লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণসেবা প্রচার কর। সনাতনকে একবার নীলাদ্রি আসিতে বলিও। তদনন্তর রূপ তথা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সনাতন গোস্বামীর নীলাদ্রি গমন।

রূপ নিলাদ্রি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার কিছু দিন পরে সনাতন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিতে ইচ্ছা

করেন।* সনাতন বৃন্দাবনে সুবুদ্ধিরায় প্রভৃতি বৈরাগী ভক্ত সাধকদিগের পবিত্র সহবাসে কিয়ৎদিন অবস্থান করিবার পর ঝারিখণ্ডের † বন্য পথে নীলাদ্রি অভিমুখে বহির্গত হইলেন। যিনি রাজসেব্য নানাবিধ সুরস ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিপুষ্ট ও সন্তৃপ্ত থাকিয়া পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের উন্নত মঞ্চে উল্লাস-তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, বৈরাগ্যের কঠোর পেষণ তিনি আর কত দিন সহ্য করিতে পারিবেন? অনাহার, অনিদ্রা, পথশ্রম ও ঝারিখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জলপান ইত্যাদি বিবিধ কারণে সনাতনের দেহ অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু (চর্ম্মরোগ) উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে শোণিত ও রস নিঃসৃত হইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া সনাতনের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়, এবং মনে মনে এই চিন্তা করিতে থাকেন যে, "আমি একে নীচ জাতি, আমার

* রূপ ও সনাতনের জগন্নাথ তীর্থে আগমন সম্বন্ধে আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থে লিখিত আছে, রূপ সনাতন দুই ভ্রাতা একত্রে বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন। "চৈতন্য-ভাগবত" অন্ত্যখণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

† চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার সময় কটক নগর ডাহিনে রাখিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন ও ক্রমে সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতীয় লোকদিগের নিবাসভূমি অতিক্রম করিয়া বারাণসীতে উপনীত হইয়াছিলেন। পুরী হইতে সোজাসুজি কাশী যাইতে হইলে ছোট-নাগপুর প্রদেশের অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্যপথ অতিবাহিত করিতে হয়। বোধ হয় এই বনপথই বৈষ্ণব গ্রন্থে "ঝারিখণ্ড বনপথ" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পাপ দেহও অতি অসার; শুনিয়াছি জগন্নাথের মন্দিরের নিকটেই চৈতন্যপ্রভু অবস্থিতি করেন। সেখানে জগন্নাথের পরিচারকেরা কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে। এ অবস্থায় যদি রথযাত্রা-কালে মহাপ্রভুর সম্মুখে জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে রথ-চক্রে এই তুচ্ছ শরীর পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে দুঃখের শান্তি হয় এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারি।" সনাতন এইরূপ চিন্তা করিয়া হরিদাসের সাধনকুটীরে সমু-পস্থিত হইলেন, এবং তৎসঙ্গে প্রেমরসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল প্রেমানন্দসুধা সম্ভোগ করত কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন এই জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গৌরাঙ্গ তথায় আগমন করিলে সনাতনের সহিত তাঁহার মিলন হইল। চৈতন্য সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে যতই অগ্রসর হন, সনাতন ততই পশ্চাতে গমন করেন আর নিতান্ত সঙ্কু-চিত হইয়া বলেন, "প্রভু রক্ষা করুন্, আমাকে স্পর্শ করিবে না, একে আমি অস্পৃশ্য হীন, কণ্ডুরসে আমার সর্ব্বাঙ্গ অপ-বিত্র, আপনার চরণে ধরি আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; অধিক কি যাঁহার অলৌকিক প্রেম গলিতকুষ্ঠ-রোগগ্রস্তকেও আলিঙ্গন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তিনি কি প্রেমাস্পদ শিষ্য ভক্তপ্রবর সনাতনের গাত্র-কণ্ডু-নিঃসৃত শোণিত রস দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন? চৈতন্যদের

সনাতনকে বলপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সনাতনের সহিত তাঁহার ইষ্টালাপ হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের মৃত্যুসংবাদ সনাতন এইখানে আসিয়া অবগত হইলেন। চৈতন্য অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠার প্রশংসা করিলে সনাতন তাঁহার গুণ স্মরণ করিয়া বলিলেন,—"অনুপম শৈশবকাল হইতে রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন; নিরবধি রামচন্দ্র ধ্যান ও রামায়ণ শ্রবণ গানে মত্ত থাকিতেন। অনুপমের বিশ্বাসের পরীক্ষার জন্য একদিন রূপ ও আমি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে বলিয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু 'রঘুনাথের চরণ কেমন করিয়া ছাড়িব' এই চিন্তাতে সমস্ত রজনী ক্রন্দন করিয়া প্রাতঃকালে আমাকে বলিলেন, 'রঘুনাথের পাদপদ্মে আমার মাথা বিক্রীত হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া টানিয়া আনিব। রঘুনাথের চরণ ছাড়িতে হইবে মনে হইলে আমার যে প্রাণ ফাটিয়া যায়। দয়া করিয়া আমাকে এই আজ্ঞা দাও, যেন জন্মজন্মান্তরে আমি শ্রীরামের চরণ সেবা করি।" তখন আমরা অনুপমকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার দৃঢ় ভক্তির প্রশংসা করিলাম। যে বংশের উপর তুমি কৃপাকটাক্ষ কর, তার সকল অমঙ্গল বিনাশ হয়।"

"সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার"॥

যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাঁহা খণ্ডে সব ক্লেশ॥"

গৌর বলিলেন, পূর্ব্বে আমি মুরারিগুপ্তকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই ভক্ত ধন্য, যিনি প্রভুর চরণ পরিত্যাগ না করেন। সেই প্রভুও ধন্য, যিনি স্বীয় ভক্ত দুর্দ্দৈববশতঃ অন্য স্থানে গমন করিলেও তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া চরণে স্থান দেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্য সনাতনকে হরিদাসের সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তিরস আস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়া আপনার আশ্রমে গমন করিলেন, এবং ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারা উত্তম মহা-প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্য প্রতিদিনই হরিদাসের কোলাহলশূন্য শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে আগমন করিয়া সনা-তনসহ সৎপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ যাপনপূর্ব্বক নির্ম্মল সুখানুভব করিতেন। রথাগ্রে সনাতনের দেহপাত করিবার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া একদিন গৌর বলিলেন, "সনাতন! দেহ-ত্যাগ করিলে যদি ভগবানকে লাভ করা যাইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে কোটি দেহ নাশ করিতে পারিতাম। দেহ-ত্যাগাদি তমোগুণের লক্ষণ, তামসিক ও রাজসিক ধর্ম্মে কৃষ্ণলাভ হয় না; কেবল ভক্তিপূর্ব্বক ভজন সাধনে তাঁহাকে লাভ করা যায়। ভক্তি ব্যতীত হরিচরণ প্রাপ্তির আর পথ নাই। ভক্তিতে ভগবানে প্রেম উৎপন্ন হয়, এই প্রেমই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির একমাত্র হেতু * দেহনাশ করা তামসিক

---

* ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥" ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।

ধর্ম্ম, তাহা পাপের কারণ বলিয়া জানিবে। ভক্তসাধক শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিকারে ব্যথিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চায় এবং গাঢ় প্রেমানুরাগ জন্মিলে প্রাণনাথের বিরহজ্বালা অসহ্য হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রেম-ব্যাকুলতাই আবার হৃদয়নাথকে হৃদয়ে আনিয়া দেয়। তুমি কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন কর, অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে পারিবে। নীচজাতি কৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য নহে, সদ্বংশজাত বিপ্র হইলেই তাহার যোগ্য হয় না। হে সনাতন! শ্রীহরির ভজনাতে জাতি-কুলের কোন বিচার নাই। যে হরির আরাধনা করে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। দয়াময় ভগবান দীন দুঃখীর প্রতিই অধিক দয়া করেন, কুলীন পণ্ডিত এবং ধনশালী ব্যক্তিরা বড় অভি-মানী। হরি-পদারবিন্দ-বিমুখ দ্বিষড়্গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা হরিগতপ্রাণ চণ্ডালও বরণীয়, ইহাই ভাগবতের উপদেশ *।

হে উদ্ধব! মৎসম্বন্ধীয় উর্জ্জিতা অর্থাৎ সাধনাত্মিকা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; কি চান্দ্রায়ণাদি, কি সাংখ্যযোগ, কি সদাচার, কি স্বাধ্যায়, কি তপস্যা, কি ত্যাগ, কিছুতেই তেমন পারে না।

* বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দলাভ
'পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ।

প্রহ্লাদ বলিতেছেন, ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, আমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, এই দ্বাদশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি হরি-পদারবিন্দবিমুখ হন, তাঁহার অপেক্ষা যে চণ্ডাল প্রাণ মন বাক্য কর্ম্ম ধন সকলই

ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ।* হরিপ্রেমই হরিকে আনিয়া দিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই; নামসংকীর্ত্তনই সকল সাধনের সার বলিয়া জানিবে। নিরপরাধে নাম লইলে প্রেমধন লাভ হয়।

গৌরের মুখে অকস্মাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সনাতন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি সকলই অবগত আছ, আমি ত কাষ্ঠযন্ত্র মাত্র, যেমন নাচাও, তেমনি নাচি, যেমন করাও তেমনি করি। আমি অতিহীন পামর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে?" চৈতন্য বলিলেন, "তোমার দেহ আমার নিজস্ব ধন, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন

ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি, যেহেতু এরূপ চণ্ডাল হইতে কুল পবিত্র হয়। কিন্তু প্রভূত গর্ব্বিত ঐ ব্রাহ্মণ, কুল দূরে থাকুক আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥

ভগবত ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! ভগবান বিষ্ণুর লীলা মহিমাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ও তাঁহার পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, তাঁহাতে দাস্যভাবে কর্ম্মার্পণ, বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা যায়, আমার বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন।

আবার পরের দ্রব্য কেন বিনাশ করিতে চাহিতেছ? ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বিচার করিতে পার না? তোমার দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব। তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য ও আচার ব্যবহারাদি নির্দ্ধারণ কর। লোক সকলকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া ও লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণসেবা প্রচার কর, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি; বৃন্দাবনে গিয়া এই সকল কার্য্য করিতে আমার শক্তি নাই। তোমার দ্বারা এই সকল মহৎ কার্য্য আমি সিদ্ধ করিব, তুমি দেহপাত করিবে ইহা কি আমি সহ্য করিতে পারি?" হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুন হরিদাস! ইনি পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, তুমি নিষেধ কর, যেন এমন অন্যায়-কার্য্য না করেন। সনাতন চৈতন্যের স্নেহবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তদীয় চরণে নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তোমার গম্ভীর হৃদয় আমি কি বুঝিব, আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, আপনাকে আপনি, চিনি না, তুমি যা করাও তাই করি।" হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর, তোমার গূঢ়তত্ত্ব কে জানিতে সমর্থ? কোন্ কার্য্য তুমি কাহার দ্বারা করাও, তুমি না জানাইলে কেহই জানিতে পারে না। অনন্তর গৌরচন্দ্র হরিদাস ও সনাতনকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় হইলেন। চৈতন্যের আদেশমত হরিদাস সনাতনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, সনাতন, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার দেহকে প্রভু নিজস্ব বলিতে-

ছেন, তোমার সমান ভাগ্যবান আর কে আছে? প্রভুর নিজের দ্বারা যাহা হইবে না, তাহা তুমি করিবে, বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া তুমি ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র প্রণয়ন ও আচার নির্ণয় করিয়া লোকশিক্ষা দিবে, প্রেমভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎ-সেবা তোমার দ্বারা প্রচারিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সনাতন, আমার এই পাপদেহ প্রভুর কোন কার্য্যেই লাগিল না, আমি মিথ্যা জীবন ধারণ করি, ভারতভূমিতে আমি বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জগতে নাম-মহিমা প্রচার করিতেছ। কেহ আপনি আচরণ করে, কিন্তু প্রচার করে না; কেহ প্রচার করে আচরণ করে না। তুমি আচরণ ও প্রচার দুই কার্য্যই করিতেছ, তুমি জগতের পূজনীয় ও সকলের গুরু, তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই।

ক্রমে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইলে গৌড়ের ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ববৎ নীলগিরিতে আগমন করিলেন। ভক্তসম্মিলনে নীলাচল আবার উল্লাস উৎসবে প্রফুল্লিত ও আনন্দানিল-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তদিগের নিকট সনাতন পরিচিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রামানন্দ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের অদ্বিতীয় রসিকগণ সনাতনের বিনয়াবনত স্নিগ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ পবিত্র প্রশান্তমূর্ত্তি, আশ্চর্য্য ভগবৎপরায়ণতা, জীবন্ত বৈরাগ্যপ্রভাব এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রান্তগা বুদ্ধি সন্দর্শন করিয়া পরম

পরিতোষ লাভ করিলেন। সনাতনের এই সকল অসাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া সকলেরই হৃদয় তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে কোন ভক্তগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিয়া সনাতনকে তথায় আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বান শুনিয়া সনাতন আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। পুরী হইতে যমেশ্বর-টোটা যাইবার দুইটী পথ। একটী সমুদ্রতীরের বালুকা-রাশির উপর দিয়া, ও অন্যটী জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া। এই পথটী ঘনবৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল ও অধিকতর নিকট। কিন্তু সনাতন আপনাকে সিংহদ্বারে প্রবেশের অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সমুদ্রতটের রৌদ্রতপ্ত বক্র পথ অব-লম্বন করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য্য-কিরণে সমুদ্রের বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়াছে, বায়ু-সন্তাড়িত প্রতপ্ত বালুকাকণা অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া দিক্‌সকল দগ্ধ করিতেছে, এই অবস্থায় সেই বালুরাশির উপর দিয়া সনাতন চলিতে লাগিলেন, পদতল দগ্ধ হইতে লাগিল, তথাপি অনুরাগের মত্ততাতে কিছুমাত্র জানিতে পারি-লেন না। তদবস্থায় সনাতনকে দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সিংহদ্বারের শীতল পথে কেন আসিলে না? সনাতন উত্তর করিলেন, আমি অস্পৃশ্য অতি হীন দুরাচার, সিংহদ্বারে যাইতে আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ সেখানে জগন্নাথদেবের সেবকেরা সর্ব্বদাই গতায়াত করেন, যদি দৈবাৎ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ

হইবে। সনাতনের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৌর বলিলেন, "যদিও তুমি পবিত্রস্বভাব এবং দেব ও মুনিগণের পূজ্য, তথাপি মর্য্যাদা-পালন সাধুর ভূষণ স্বরূপ। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। তুমি মর্য্যাদা রক্ষা করিলে দেখিয়া আমি আনন্দলাভ করিলাম, তুমি এরূপ না করিলে আর কে করিবে?" এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য কণ্ডুরস-শোণিতাক্ত সনাতনকে পুনঃ পুনঃ প্রেমালিঙ্গন দান করি-লেন।

সনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যবনের দাসত্ব ও ঘনিষ্ঠ সংশ্রব-হেতু তৎসাময়িক হিন্দুসমাজে পতিতবৎ থাকিলেও তাঁহার নির্ম্মলস্বভাব, জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবন্নিষ্ঠা বশত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনি এরূপ ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না যে এজন্য গর্ব্বিত হইয়া অন্যের মর্য্যাদাভঙ্গ করিবেন। বরং তিনি ভক্তগণের এতাদৃশ শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং গৌর-চন্দ্রের প্রেম আলিঙ্গন ও তাঁহার প্রশংসার উৎপীড়নে উৎ-পীড়িত হইয়া আপনার হীনতা অনুভব করত নিরতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। সাধুচরিত্রের লক্ষণই এইরূপ।

একদিন সনাতন অতি নির্ব্বিন্নচিত্তে জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলিলেন, "আমি প্রভুকে দর্শন করিয়া দুঃখ দূর করিতে এখানে আসিলাম, এখন দেখিতেছি হিতে বিপ-রীত হইল। আমি অতি নিকৃষ্ট পামর, নিষেধ না মানিয়া প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কণ্ডুরক্তরস প্রভুর অঙ্গে স্পর্শ হয়, এই মহা অপরাধে আমার আর নিস্তার নাই। কি করিলে হিত হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সনাতনের আন্তরিক গ্লানি দুঃখ দেখিয়া জগদানন্দ বলিলেন; বৃন্দাবনই তোমার যোগ্য বাসস্থান। রথযাত্রা দেখিয়া সেই-খানে গমন কর। প্রভু তোমাদের দুই ভাইকে ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। জগদানন্দের পরামর্শ শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়া সনাতন গৌরকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন মনে করি-লেন। তৎপরে চৈতন্য তথায় সমাগত হইলে, সনাতন দূর হইতে প্রণাম করিলেন। আলিঙ্গন করিবার জন্য চৈতন্য বার বার যতই ডাকেন, সনাতন ততই পশ্চাতে সরিয়া যান। তখন চৈতন্য বলপূর্ব্বক ধরিয়া সনাতনকে কোল দিলেন। সনাতন কাতর হৃদয়ে বলিলেন, "দেখিতেছি হিতের জন্য আসিয়া বিপরীত হইল। কোথায় তোমার সেবা করিবারও যোগ্য নহি, না নিত্য নিত্য আরও অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। একে আমি পাপাশয়, দুষ্ট নীচজাতি, তোমার স্পর্শের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাতে আমার শরীর দিয়া ক্লেদ্ রক্ত রস নির্গত হইতেছে, তথাপি তুমি বল পূর্ব্বক আলিঙ্গন কর। ইহাতে আমার কত যে অকল্যাণ হইতেছে, তাহার সীমা নাই। অনুমতি কর, রথ দেখিয়া বৃন্দাবন গমন করি। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও এই উপদেশ দিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র ক্রোধ প্রকাশকরতঃ জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি! ব্যবহার ও পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য ব্যক্তি, কালিকার জগা আপনার মূল্য না জানিয়া তোমাকে উপদেশ দেয়, এ অতি আশ্চর্য্য!" শ্রবণ করিয়া সনাতন বলিলেন, জগদানন্দের সৌভাগ্য আমি

আজ জানিলাম। তুমি তাহাকে আত্মীয় জ্ঞানে শাসনচ্ছলে "আস্মতা স্বধারস" পান করাইয়া আমাকে গৌরবস্তুতিরূপ "নিম্ব-নিষিন্দা-রস" দিতেছ। আজিও আমাকে তোমার আত্মীয় জ্ঞান হইল না, ইহাই আমার মহা দুর্ভাগ্য। সনাতনের বাক্যে চৈতন্য প্রভু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সনাতন, জগদানন্দ তোমা হইতে আমার প্রিয় নয়। তুমি এক জন শাস্ত্রদর্শী প্রবীণ পণ্ডিত, কত স্থানে তুমি আমাকে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছ, বালক জগা তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে উপদেশ দেয়, ইহা আমার অসহ্য। তোমাকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্তুতি ও জগদানন্দকে অন্তরঙ্গ জ্ঞান করিয়া তিরস্কার করিতেছি এমন মনে করিও না। তোমার গুণে বাধ্য হইয়া তোমাকে স্তুতি করিতে হয়। এক ব্যক্তির বহুজনে মমতা হইলেও সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রীতি প্রকাশ পায় না। বৈচিত্র্যই প্রেমের স্বভাব, পাত্র ভেদে তাহার নানা ভাবোদয় হইয়া থাকে। তোমার দেহ আমার নিকট অমৃত-তুল্য ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তুমি তাহা ঘৃণা কর। আমি সন্ন্যাসী, পঙ্ক চন্দনে সমদৃষ্টি আমার ধর্ম্ম। তোমাকে ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়।" ইহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, তোমার এ প্রতারণা বাক্য আমি মানি না। আমার ন্যায় অধম পাতকীকে যে তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, ইহাতে তোমার দীন দুঃখীর প্রতি দয়াগুণই প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হরিদাস সনাতন, তবে প্রকৃত কথা বলি শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি। মাতা যেমন সন্তানের

মলমূত্র-দূষিত অঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া সুগভীর আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়েন, সনাতনের দেহও আমার পক্ষে সেইরূপ। সনাতনের কণ্ডুক্লেদময় দেহে আমার ঘৃণা হয় না। বৈষ্ণব-শরীরকে সাধারণ মনে করিও না। তাহা চিদানন্দময় ও অপ্রাকৃত। ভক্ত যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নামে দীক্ষিত হয়, শ্রীহরি তখন তাহার দেহকে আপনার ন্যায় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় করিয়া ল'ন, ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে ভগবানের ভজনা করেন। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন, মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একাত্মা হইয়া যায়। সনাতনের শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন করিয়া ভগবান আমাকে পরীক্ষা করিলেন, আমি ইহাতে ঘৃণা করিলে প্রভুর নিকট অপরাধী হইতাম। সনাতন, তুমি দুঃখ করিও না, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি অতুল আনন্দ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি এইখানে থাক, তার পর তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব। "চৈতন্য চরিতামৃতে" কথিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গ সনাতনকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের কণ্ডুরোগ আরোগ্য হইল এবং দেহ সুবর্ণকান্তি ধারণ করিল।

অনন্তর দোলযাত্রার উৎসব সমাপ্ত হইলে, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতন কি কি কার্য্য করিবেন, তাহার উপদেশ দিয়া চৈতন্য তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে উভয়ের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে আবেগ সম্বরণ করিয়া সনাতন বিদায় হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে গৌরচন্দ্র ছোটনাগপুর প্রদেশের যে যে গ্রাম জনপদ, এবং নানাজাতি-বিহঙ্গ-নিনাদিত স্থরম্য কাননকুঞ্জ, প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা, স্বচ্ছ-সলিলা গিরিনির্ঝরিণী ও সুশোভন গিরিচূড়া প্রভৃতি বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভার আকর স্বরূপ বনভূমির মধ্য দিয়া নানা লীলা বিলাস করিতে করিতে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, বলভদ্রের নিকট সনাতন তৎ-সমুদায় লিখিয়া লইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রূপ সনাতনের বৃন্দাবনবাস ও জীব গোস্বামীর

পুরুষোত্তম হইতে সনাতন বৃন্দাবন পৌঁছছিবার কিয়দ্দিন পরে, রূপ গোস্বামী তথায় আসিয়া মিলিত হন। রূপ, নীলাদ্রি হইতে স্বদেশে আসিয়া অর্থ সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, আত্মীয় কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণকে এবং দেবসেবার জন্য বিতরণ করিয়া দিলেন। গৌড় নগরে তাঁহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত যে সকল অর্থাদি ছিল, তাহাও এই জন্য আনাইলেন। এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে বঙ্গদেশে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হয়। পরে নিশ্চিন্ত হইয়া বৃন্দাবনে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস ও

গোপালভট্ট প্রভৃতি সংসারবিরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধু ভক্ত মহা-আদের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করেন। রূপ সনাতনের এক মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবল্লভতনয় জীব গোস্বামীও হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে জীব গোস্বামী সম্বন্ধে লিখিত আছে, তিনি শৈশবকালে রূপ সনাতনের নিকটে রামকেলিতে অবস্থিতি করিতেন। এই সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পরে তাঁহার পিতা বল্লভ রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদর্শনার্থ প্রয়াগ গমন করিলে, তিনি চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি অল্প বয়সে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জীবের বৈরাগ্যোদয় হয় ও তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি আজীবন দার পরিগ্রহ করেন নাই। তৎকালে অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপ ধামে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত হরিভক্তিবিধান প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জীবকে বৃন্দাবন ধাম গমন করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে জীব অবিলম্বে বৃন্দাবনোদ্দেশে যাত্রা করিয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইলে মধুসূদন বাচস্পতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাচস্পতি একজন কাশীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। জীব তাঁহার নিকটে কিছু দিন ন্যায় ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনেই কাশীধাম মধ্যে ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি মথুরা মণ্ডলে চলিয়া আসিলেন, এবং পিতৃব্যদিগের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

তদবধি আর বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। জীব, রূপের মন্ত্রশিষ্য ও পিতৃব্যদ্বয়ের অনুরূপ গুণবান, প্রেমিক, ভক্ত, ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। রূপ গোস্বামীর নিকটে তিনি সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। তত্ত্বশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান প্রতিভা অসাধারণ ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একমাত্র আচার্য্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বল্লভাচার্য্য স্বপ্রণীত "তত্ত্বদীপ" গ্রন্থ জীবকে দেখাইলে, তিনি উক্ত গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক বিস্তর বৈদান্তিক-বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, জীব, বেদান্তবিদ্যায় রামানুজের তুল্য পণ্ডিত ছিলেন। যাহা হউক, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীকে চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বেদব্যাস বলা যাইতে পারে। তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ ও প্রেমভক্তিরসাত্মক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্মকে ভারতে দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমভক্তিরসের গভীর সিদ্ধান্ত সকল সুশৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া ভক্তি-তত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা বৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে যৎসামান্য মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে জীবন ধারণ করত তরুতল আশ্রয় করিয়া কেবল হরিগুণানুকীর্ত্তন, গ্রন্থানুশীলন ও গ্রন্থরচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। ইঁহারাই এপ্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার রস মাধুর্য্য কামগন্ধশূন্য পবিত্র ভাবে

গ্রহণ করিয়া তাহা প্রচার করেন।

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিরস ব্যাখ্যান, উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলা, বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণন করেন। তদ্ভিন্ন দানকেলিকৌমুদী, গোবিন্দবিরুদাবলী, মথুরামাহাত্ম্য, হংসদূত, লঘুভাগবতামৃত, স্তবমালা, উদ্ধবসন্দেশ প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, রাসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রসলীলা ও বৈষ্ণবদিগের নিত্যকৃত্য আচার ব্যবহারাদি বিবৃত করিয়াছেন। জীব গোস্বামী গোপালচম্পু, উপদেশামৃত, ষট্সন্দর্ভ * প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদ্ভিন্ন গোপালতাপনী, ব্রহ্মসংহিতা, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় রূপ গোস্বামীকৃত রিপুদমন বিষয়ে রাগময়-কোণ ও সনাতন গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে রসময়-কলিকা এবং জীবগোস্বামী প্রণীত করচা গ্রন্থ আছে, কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য।

শ্রীচৈতন্য রূপ সনাতনকে মথুরা বৃন্দাবনের বিলুপ্তপ্রায় তীর্থ সকল পুনরুদ্ধার কারবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করি-

---

* ইহার অন্য নাম "শ্রীভাগবতসন্দর্ভ"। এই গ্রন্থ ছয় ভাগে বিভক্ত বলিয়া ইহাকে "ষট্সন্দর্ভ" বলে। যথা:—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ।

ছিলেন। * ইহাতে অনুমান হয়, তৎসময়ে মথুরা বৃন্দাবন পরবর্ত্তী কালের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল না। একণে যে স্থানে যে যে দেবালয় কুঞ্জ কুটীর প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা বিদ্যমান ছিল না। চৈতন্যের পরবর্ত্তী সময়ে বৃন্দাবনধাম বিশেষ ভাবে বিখ্যাত হইয়া উঠে, এবং স্থানে স্থানে দেবমন্দির ও সাধক ভক্তদিগের লতাকুঞ্জশোভিত সুরম্য সাধনাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্য শ্রীতে শোভান্বিত হয়। চৈতন্যের সময়ে যে দুই চারি জন ভক্তবৈষ্ণব তীর্থদর্শনের উদ্দেশে বৃন্দাবন আসিতেন, তাঁহারা তীর্থ মনে করিয়া বৃন্দাবনের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করিয়া রাধাকুণ্ড তীর্থের অনুসন্ধান করেন, তখন কেহই তাঁহাকে রাধাকুণ্ডের কথা বলিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি তীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছে জানিয়া, একস্থানে ধান্যক্ষেত্রের অল্প জলে স্নান করিলেন। ইহা দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা বিস্মিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এইস্থান রাধাকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরীসম্প্রদায়ের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী মথুরায় আগমন করিয়া গোপালমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, এবং রূপ গোস্বামী মথুরামাহাত্ম্য-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লোপপ্রাপ্ত তীর্থ সকল পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দদেব ও মদনগোপালের সেবা রূপ সনাতনই প্রচার করেন। মদনমোহন ও গোবিন্দজীর মন্দির, যাহা ভগ্নাবস্থায় এখনও বৃন্দাবনে অবস্থিত আছে, তাহা

* কবি কর্ণপুর প্রণীত সংস্কৃত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের ৯ম অঙ্ক।

রূপ সনাতন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু গোবিন্দজীর মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিল্প-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, পৃথুরাও কুলোদ্ভব মানসিংহ তাহা স্থাপিত করেন। * চৈতন্য-দেব ১৪৫৫ শকে অন্তর্হিত হয়েন, সুতরাং শিল্পলিপি অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির গৌরলীলাসমাপ্তির ৫৭ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। রূপ সনাতন এতদিন পর্য্যন্ত ইহলোকে ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এই মন্দির মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত হইলেও রূপ সনাতন কোনরূপে তাহার পরম্পরা-কারণ হইতে পারেন।

মদনমোহনের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সনাতন গোস্বামী প্রথমতঃ যমুনাতটে সূর্য্যঘাট নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী এক নিভৃত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মদনমোহন-বিগ্রহ সংস্থাপিত করেন। কিয়দ্দিন পরে কোন একজন বণিক নাট্যশালা ও রত্নময়-বেদী-সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত করেন ও মদনমোহন বিগ্রহের রীতিমত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এইরূপ কথিত আছে, শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন সনাতন যমুনাতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী মূল্যবান রত্ন দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, কোন দীন দুঃখীকে ইহা দান করিবেন।

* "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ১৭৭১ শকাব্দ, ১৩২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু ধন রত্ন স্পর্শকরা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, এই জন্য উহা একখানি খাপরাতে উঠাইয়া লইয়া কোন স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিলেন। বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ মানকর গ্রামনিবাসী জীবন নামক এক ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। এ ব্যক্তির অনেক পরিবার অথচ কিছুই অবলম্বন ছিল না। ব্রাহ্মণ অর্থের আকাঙ্ক্ষায় কাশীতে গিয়া বহুদিন শিবের আরাধনা করেন। শিব প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাবস্থায় এই আদেশ করেন, বৃন্দাবনে সনাতন নামে এক গোঁসাঞি আছেন, তাঁহার নিকটে গমন করিলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এ সংসারে কোন্ সূত্রে কি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় কে বলিতে পারে? ব্রাহ্মণের ভববন্ধন মোচনের সময় উপস্থিত, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই, সামান্য ধনের চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া আছেন; কিন্তু অচিরে তিনি যে পরম ধন প্রণারাম ভগবানকে হৃদয়ে লাভ করিয়া ভব-যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিধাতা যখন দুঃখী জনের প্রতি দয়া করেন, তখন কাচ অন্বেষণ করিতে গেলেও তিনি দিব্যরত্ন মিলাইয়া দেন,—গরল প্রার্থনা করিলেও অমৃত দান করেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের আশ্রমে সমাগত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং আনন্দাবেশে করযোড়ে রহিলেন। সনাতনও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন "ঠাকুর মহাশয়, তুমি কে? এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়া আমার প্রতি কৃপা করিলে?" সনাতনের নম্রতাপূর্ণ প্রিয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্রের চিত্ত চমৎকৃত ও দ্রবীভূত হইয়া

গেল। ব্রাহ্মণ সকল কথা সনাতনকে বিজ্ঞাপিত করিলে, সনাতন বলিলেন, আমি ভিক্ষাজীবী, কোথায় অর্থ পাইব? শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, নিরাশ হৃদয়ে নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের কাতরতা দেখিয়া সনাতন আকাশ পাতাল ভাবিয়া আকুল হইলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ মণির বৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণকে আশ্বাসিত ও শান্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমার স্মরণ ছিল না, মহাদেব মিথ্যা বলেন নাই, বহুমূল্য মণি পাইবে, আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দিই।" সনাতন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে গেলেন, এবং বামহস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিলেন, "এই স্থানের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখ।" ব্রাহ্মণ মৃত্তিকা খনন করিয়া মণি না পাইয়া সনাতনকে বলিলেন, "তুমি উহা উঠাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন, আমি স্নান করিয়াছি, স্পর্শ করিব না। পুনর্ব্বার খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রাহ্মণ মণি পাইলেন এবং গোঁসাঞিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পথে যাইতে যাইতে জীবন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, গোঁসাঞি এমন মূল্যবান রত্ন কেন আমাকে দিলেন, ইহা রাখা কি স্পর্শ করা দূরে থাকুক, একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আর আমি ইহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, এই ত আমার চরিত্র! ছি! ছি! আমার এই ঘৃণিত জীবনে শত ধিক্! আর এই রত্নকেও ধিক্! এই অসার বস্তু দূরে পরিত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার চরণে শরণ লইব, তিনি যে ধন পাইয়া মজিয়া আছেন, আমি

আদরাই লইব, বিনা মূল্যে আমি তাঁহার পদে বিক্রীত হইব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বটেশ্বর গ্রাম হইতে ফিরিয়া গেলেন, এবং সনাতনের পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তুচ্ছ মণি মুক্তাতে আমার আর প্রয়োজন নাই, কৃপা করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়া কৃষ্ণ-প্রেমধন দান করিয়া কৃতার্থ কর।" গোঁসাঞি বলিলেন, "তুমি তাহা পাইবে না, গৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি গৃহে যাইব না, তোমার চরণই একমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া মূঢ় জনকে আশ্রয় দাও।" সনাতন বলিলেন, যদি মণি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হও, তবে হরিধন পাইবার যোগ্য হইবে। এই কথা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণ মণি যমুনা মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া সনাতন মহা আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং বিস্তর প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ধন্য সনাতন! তুমিই প্রকৃত স্পর্শমণি, তোমার পবিত্র সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ধনের পিপাসা মিটিয়া গেল। তদবধি এই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারা মানকর পরিত্যাগ করিয়া কাঠমাড়গাঁ গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

রূপ সনাতন বিবিধ শাস্ত্রে যদিও প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি নিরভিমান নির্ম্মৎসর হইয়া আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন জ্ঞান করিতেন। যাঁহারা পৃথিবীর মান সম্ভ্রম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভোগৈশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পরমে-

শ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন, প্রাকৃত জনোচিত গর্ব্ব অভিমান তাঁহাদের স্বর্গীয় হৃদয়ে কি প্রকারে স্থান পাইবে? একদা একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া রূপ সনাতনকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করেন। হরিপ্রেমে প্রেমিক নিরহঙ্কার রূপ সনাতন বিনা বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। এই সময়ে জীব গোস্বামী যমুনাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জীবকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং জীবকে বলিলেন, রূপ সনাতন বিচারের ভয়ে আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তুমি হয় বিচার কর, নতুবা জয়পত্র লিখিয়া দাও। জীব ইহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ ব্যক্তি রূপসনাতনের মহিমা কিছুই জানে না, পণ্ডিতাভিমানী হইয়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়াছি মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেছে, এই গর্ব্ব খর্ব্ব করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, বিনা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে তুমি তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পরাভূত করিলে? যাহা হউক, আমি তাঁহাদের একজন ক্ষুদ্র শিষ্য, আমাকে পরাভব কর, দেখি কেমন তোমার পাণ্ডিত্য। এই বলিয়া জীব শাস্ত্রবিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিলেন। রূপ গোস্বামী এই বিচারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং জীবকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি জয় পরাজয় মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, তবে কেন পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিলে? আপনি পরাভব স্বীকার করিয়া অমানী হইয়া দীনতার সহিত

কেন তাহাকে মান ও জয়দান করিলে না? জীব বলিলেন, গুরুনিন্দা অসহ্য,—এই জন্য বিচার করিয়াছি। জীব গোস্বামীর অভিমান নাই, রূপ তাহা জানিতেন, তথাপি লোকশিক্ষার উদ্দেশে শাসন করিবার জন্য বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।" গুরুদেবের এই বাক্য বজ্রের ন্যায় জীবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, কাতর হৃদয়ে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতেও রূপ প্রসন্ন হইলেন না। অবশেষে অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতটে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া গুরু-পদধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। গুরু-বিরহ-শোকে দুই নয়নে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল। কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাতে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিল। সনাতন জীবের এরূপ কষ্টকর অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং রূপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যতপ্রকার সদাচার আছে,তন্মধ্যে সকলের ইষ্টজনক শ্রেষ্ঠ সদাচার কি? রূপ বলিলেন, প্রভু, আমার বিবেচনায় জীবে দয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদাচার। সনাতন বলিলেন, তবে কেন তাহা হয় না? তখন রূপ এই বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবকে আহ্বান করিলেন, এবং স্নেহসহকারে ছলছল নয়নে আলিঙ্গন করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। জীবও গুরুপদে শত শত প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রূপ বৃন্দাবনে আগমন করার পর অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন দিন অনাহারে কাটাইয়া দিতেন, কোন দিন কিঞ্চিৎমাত্র দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সনাতন ইহা অবগত হইয়া একদিন অনুযোগ

করিয়া রূপকে বলিলেন, তুমি অনশন থাকিয়া কৃষ্ণকে কেন দুঃখ দাও, মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদর পূর্ণ কর। তদনুসারে রূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ রূপ নিজে রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করিতেন, পরে সনাতনের আদেশে স্বপাক-ভোজন পরিত্যাগ করেন।

তৎকালে মহানুভব আকবরসাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি সনাতনের মহত্ত্ব ও সাধুতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার দর্শন লালসায় বৃন্দাবনে আইসেন। বিরক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন অবৈধ জ্ঞান করিয়া প্রথমতঃ সনাতন আকবরের সহিত কথা কহেন নাই। পরে আকবরকে ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্ত জানিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আলাপ করেন। সনাতনের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহা পূরণ করিবেন, আকবরের এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিঃসঙ্গ বীতস্পৃহ ভগবৎপ্রেমিক বৈরাগীর কামনা পূর্ণ করা সম্রাটের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভগবৎ-চিন্তাতে হৃদয়মনকে নিমগ্ন করিয়া সাধুরা যে নির্ম্মল শান্তি ও শাশ্বত সান্দ্রানন্দ সম্ভোগ করেন, তাহা পৃথিবীর অতীত বস্তু। ভক্তের হৃদয় যে পিপাসায় পিপাসিত, পৃথিবীর পঙ্কিল বারিতে তাহা নিবারিত হইতে পারে না। সাধক ভক্ত ঊর্দ্ধে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ এবং নিম্নে স-সাগরা সকাননা কুসুমকুন্তলা ধরণী, এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টিতে ও আপনার মানস-পটে প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং দীপ্যমান মঙ্গলভাব অবলোকন করিয়া যে সুগভীর আনন্দার্ণবে আপনাকে নিমজ্জিত করেন, তাহার সহিত পার্থিব কোন্ আনন্দের তুলনা হইতে পারে?

কোন আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন,

"নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ।
মাধুর্য্যৈকরসাধার একএবাস্তি সর্ব্বতঃ॥"

ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর, নিবিড় আনন্দস্বরূপ, সুধার সমুদ্র এবং মাধুর্য্য রসের একমাত্র আধার। যাঁহারা সেই সুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন, এবং সেই প্রগাঢ় মাধুর্য্য রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিয়া আপ্তকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন্ কামনা অবশিষ্ট ও অপূর্ণ আছে যে, তাঁহারা ইতর জনের ন্যায় রাজপ্রসাদের জন্য লালায়িত হইবেন? ফ্রান্স দেশীয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তি জনকোলাহলময় নগর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময় বিজনপল্লীতে বাস করিতেন। সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁহার ধার্ম্মিকতাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সাধু পুরুষ বলিয়াছিলেন, আমি রাজপ্রাসাদে গমন করিলে হতবুদ্ধি ও অপ্রস্তুত হইয়া যাইব, আর রাজা আমার কুটীরে আসিলে কষ্ট অনুভব করিবেন, অতএব যিনি যেখানে আছেন, তিনি সেই স্থানেই থাকুন, ইহাই সৎপরামর্শ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার কোন সময়ে গ্রীক্‌দেশীয় সন্ন্যাসী দায়োজিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া রাজ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার নিকটে কি প্রার্থনা কর?" দায়োজিনিস তখন রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—তোমার নিকটে আমার কিছুই প্রার্থনা নাই, তুমি মৎসমীপে দণ্ডায়মান থাকাতে আমার রৌদ্র পোহাইবার ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব তুমি সরিয়া দাঁড়াও,

যাহা তুমি দিতে পার না, তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না।" আরব দেশের খ্যাতনামা সম্রাট হারুঁরশিদ তদ্দেশীয় তাপস-বিশেষের দর্শন লাভের নিমিত্ত জনৈক অনুচরকে তাঁহার আশ্রমে প্রেরণ করিলে, সেই মহাতেজা তপস্বী অনুচরকে গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন,—আমার নিকটে সম্রাটের কি প্রয়োজন—আমারই বা তাঁহার নিকটে কি "প্রয়োজন? আমাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিও না। আমাদের ভক্ত সনাতনও আকবরকে বলিয়াছিলেন, আমার কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই। শেষে সম্রাট নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে সনাতন বলেন, যদি একান্তই আমাদের উপকার করিতে আপনার বাসনা হয়, তবে আমাদের আশ্রমের যে অল্পস্থানটুকু যমুনার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা বান্ধাইয়া দিন।* সনাতনের এবম্বিধ তীব্র বিষয়বৈরাগ্য ও জলন্ত ঈশ্বরপ্রেমিকতা সন্দর্শন করিয়া আকবরের গর্ব্ব অভিমান দূর হইয়া গেল। বিনয়াবনম্র হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "যিনি ত্রিজগতের নাথ পরম দুর্লভ ও দুরারাধ্য, তিনি আপনার হৃদয়ধামে সদা বিরাজমান, আপনি সেই দেবদুর্লভ

* "অর্থতো তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা যদি শুন তবে কহি॥
এই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্পস্থান হয়॥
এই স্থানটুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ।
তব স্থানে মুক্তি আর কিছু নাহি চাহ॥"

ভক্তমালগ্রন্থ।

মনুষ্যধনে পরম ধনী হইয়াছেন, আমি আপনার কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব, আমার রাজত্বের গৌরব বৃথা অভিমান মাত্র।”

রূপ সনাতনের প্রাকৃত জীবন সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাঁদিগের পার্থিব জীবন বৃন্দাবন ধামেই নিঃশেষিত হয়। চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের ঠিক কত দিন পরে রূপ ও সনাতনের পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা আজিও অসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। ১৪৭৬ শকে সনাতন “বৈষ্ণব তোষণী” রচনা করেন। তাঁহার আদেশে জীবগোস্বামী এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ ১৫০৪ শকে লিখিয়াছিলেন।* “নরোত্তম বিলাস” গ্রন্থে লিখিত আছে, চৈতন্যান্তর্দ্ধানের অনেক দিন পরে খেতরীনিবাসী নরোত্তম ঠাকুর যখন যৌবনের প্রথমাবস্থায় বৃন্দাবনে ভক্তমণ্ডলীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে রূপ ও সনাতন গোস্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর “শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত” গ্রন্থ রচনা ১৫৩৭ শকে † সম্পূর্ণ হয়, তৎকালে কেবল জীব গোস্বামীই জীবিত ছিলেন। বৃন্দাবনে ইহাঁদের সহিত নরোত্তম ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সকল কারণে

---

* সজ্জনতোষণী, ২য় খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা।

† ২ “শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।”

ছেন। ধন, মান বিদ্যা বুদ্ধি সকলই ইহাঁরা পরমেশ্বরের সেবাতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রদীপ্ত-বহ্নিশিখাবৎবৈরাগ্য ও স্বর্গীয় জীবনের পুণ্য-প্রভায় শত শত ব্যক্তির ঘোর সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা তৃণবৎ দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণের পুণ্য-বারি-বিধৌত মুখমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব নিহিত আছে। তাঁহাদের সংস্পর্শ মাত্রে সংকীর্ণচেতা সংসার-সর্ব্বস্ব ইন্দ্রিয়-লোলুপ সহস্র সহস্র লোকের মোহ-যবনিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। জরা-ব্যাধি-শোকতাপে সন্তপ্ত, বিবিধ দুর্নীতি ও পাপভারে ভারাক্রান্ত এবং সংসারামোদে আসক্তচিত্ত নরনারীর মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে ধর্ম্মের বিমল আলোক প্রতিভাসিত করাই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। রূপ সনাতন প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগী উদাসীন ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সাধু দৃষ্টান্তে এবং ইহাঁদিগের মুখারবিন্দ-বিগলিত ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত উপদেশ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া কত কত ধনী-সন্তান পরমার্থ-রসপানে প্রমত্ত হইয়া সংসার-সুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে যে কেহ ইহাঁদের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

যখন বঙ্গীয় জনসমাজ ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল ভাবকে বিস্মৃত হইয়া কেবল শুষ্ক-কর্ম্মবন্ধনে জড়িত ছিল, সেই সময়ে ইহাঁরা শুদ্ধভক্তিরূপ অমৃত ফলের আস্বাদন করত পরবর্ত্তী লোকদিগের জন্য গ্রন্থাকারে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। চারি শত বৎসর

পূর্ব্বে ইহাঁরা যে সকল অমূল্য সত্য জীবনে পরিণত ও প্রাণপ্রদ বাক্যে প্রচারিত করত নীরসচিত্ত লোকদিগের হৃদয়ে প্রেমধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও সুদূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্থলে স্পৃষ্ট হইয়া আমাদের কঠোর চিত্তকে বিগলিত করিয়া তুলিতেছে। কালের পরিবর্ত্তনে দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিশয় হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে, যদিও তাহারা বিশুদ্ধজ্ঞানানুশীলনের অভাববশত নানাপ্রকার কুসংস্কার, অন্ধতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের আশ্রয়-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই সকল পূর্ব্বতন বৈষ্ণবাচার্য্যের অসামান্য সরলতা ও অপরিমেয় প্রেমাভিষিক্ত পবিত্র জীবন, এবং ইহাঁদিগের প্রদত্ত অমূল্য উপদেশমালা আজিও শত প্রকার অনাচার ও অসাত্ত্বিকতা এবং ভ্রষ্টাচার ও পাপাচারের মধ্যেও বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মভাবে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ে যে পরিমাণে অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি, আচারনিষ্ঠা, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ ও হৃদয়বিমোহন বিনয়-বৈরাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্রে তাহা অতি দুর্লভ।

পরিশিষ্ট।

"বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পরমেশ্বরের প্রতি মানবের প্রেম ভক্তিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঃ—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। শান্তরস দুই গুণ-বিশিষ্ট,—ইহার একটী ঈশ্বরে একান্ত নিষ্ঠা ও অপরটী বিষয়াসক্তি বর্জ্জন। আকাশের গুণ শব্দ যেমন যাবতীয় ভৌতিক পদার্থেই বিদ্যমান আছে, সেইরূপ শান্তরসের এই গুণদ্বয় সকল ভক্তচরিত্রের মূলেই নিহিত আছে। শান্তরসের অনুশীলনে মনোমধ্যে ভগবৎ-সত্তার সঞ্চার হয়। সুতরাং ইহাকে ভক্তির পত্তনভূমি বলা যায়। সনক সনাতনাদি মহর্ষিগণ এই রসের সাধক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ দাস্যরস,—এই রসে শান্তরসের দুই গুণ বিদ্যমান আছে, অধিকন্তু ইহা ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত সম্ভ্রম ও গৌরবসূচক সেবার ভাবেও পরিপূর্ণ। ঈশ্বরোপাসকগণ সাধারণতঃ এই ভাবের সাধক মধ্যে পরিগণিত হন। তৃতীয়তঃ সখ্যরস,—এইরসে শান্তের অনাসক্তি ও ভগবৎ নিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবা বিদ্যমান আছে। তদতিরিক্ত প্রেমাস্পদ বন্ধুর প্রতি যেরূপ একান্ত বিশ্বাস এবং সর্ব্বতোভাবে সঙ্কোচশূন্য আত্মীয়তার উদ্রেক হয়, সেই প্রকার এই রসেও ঈশ্বরের প্রতি এই সকল ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। ভীমার্জ্জুন ও শ্রীদামাদি ব্রজবালকগণ এই রসের সাধক ছিলেন। ইহার পর বাৎসল্য,—বাৎসল্যে শান্ত দাস্য ও সখ্যরসের সমুদায় ভাব নিহিত আছে, তদ্ভিন্ন আপনাকে প্রতিপালক ও ভগবানকে প্রতিপাল্যভাবজনিতস্নেহ এই রসের মূল। নন্দ ও যশোদার ভাবই বাৎসল্য রস। পঞ্চমতঃ মধুর,—এই রসে পূর্ব্বোক্ত চারি রসের সমুদায় ভাব মিলিত হইয়াছে। অধিকন্তু আত্মসমর্পণই ইহার মূল ভাব। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু,

আকাশ, এই পঞ্চভূতের গুণ যেমন পরস্পরাভাবে মিলিত হইয়া মৃত্তিকাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা মৃত্তিকাতে একাধারে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রকার শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যরসের গুণ বাৎসল্যে ও বাৎসল্যের গুণ কান্তভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহা মাধুর্য্যরস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্য রসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় ইহা অমৃতাস্বাদযুক্ত ও হৃদয়োন্মাদক। পতিপ্রাণা সতী যেমন প্রাণপতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, তদ্রূপ একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের যে ভজনা, বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে তাহাই কান্তভাব বা মাধুর্য্যরস। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে পঞ্চবিধ রসের মধ্যে এই মধুর রস অর্থাৎ নায়ক নায়িকার ভাবই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের অভ্যন্তরে সকল প্রেমের সম্বন্ধই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। সাধ্বী স্ত্রী প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া অসঙ্কোচে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করেন, সখীর ন্যায় উপদেশ দেন, দাসীর ন্যায় সেবা করেন, পিতামাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন এবং শিষ্যের ন্যায় অনুগতা হয়েন। এই কারণ বৈষ্ণব মতে মধুর রসের সাধনে পরমেশ্বরে চিত্তের উন্নয়ন ও অব্যভিচারী স্থিতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রজধামের গোপাঙ্গনাগণ এই মাধুর্য্য রসে বা নায়ক নায়িকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

ভগবৎসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নাম সাধন *। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ, বৈধী

* "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন।

ও রাগানুগা। স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, অথচ শাস্ত্রবিধির অধীন হইয়া ভজনা করাই বৈধী অর্থাৎ বিধিসিদ্ধ। ভক্তি-শাস্ত্রে এই সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ লিখিত হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি বিধি-নিষেধ-নিরপেক্ষ, কেবল রাগময়ী, এই জন্য বৈধী অপেক্ষা তাহা অতি প্রবলা। বৈধী ভক্তির উদ্দেশ্য এই যে, সাধন বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ ও রুচি না থাকিলেও সাধন-নিষ্ঠা বশতঃ ক্রমে প্রকৃত প্রেম-রসের উদ্দীপন হইবে। আর স্বাভাবিক রুচিতে প্রবল অনুরাগের পথে আত্মবিসর্জ্জনই রাগাত্মিকা প্রগল্‌ভা ভক্তি। মাধুর্য্য রসের রসিক ব্রজবাসী জনের ইহাতে মুখ্য অধি-কার *। ইষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে স্বাভাবিক গাঢ় তৃষ্ণাই ইহার স্বরূপ-লক্ষণ। বর্ষার অবিরত ধারা বর্ষণে সাগরমুখগামিনী স্রোতস্বিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া যেমন তটভূমি প্লাবিত করিয়া ছুটিতে থাকে, সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ জন্মিলে সাধক বেদ বিধি লৌকিকাচার কুলমান প্রভৃতির বন্ধন ছেদন করিয়া প্রেমময়ের উদ্দেশে প্রধাবিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রেমরস আস্বাদন করাই জীবের চরম উদ্দেশ্য। বৃন্দাবনের গোপ গোপিকারা এই নিঃস্বার্থ প্রেমেই পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

---

* মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানধাম, দ্বারকা ঐশ্বর্য্যধাম, আর প্রেমধামের নাম বৃন্দাবন। উপাসনার মূলই প্রেম। যাঁহারা ভক্তিপ্রেমোপচারে ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে এখানে ব্রজবাসী বলা হইয়াছে।

১' ঈশ্বরকে হৃদয়স্বামীরূপে উপাসনা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। প্রেমের তীব্রতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরকীয়া রসের অবতারণা। ব্রজাঙ্গনাগণ অন্যের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও কৃষ্ণানুরাগিণী,—অর্থাৎ প্রেমাস্পদের জন্য তাহারা তাড়ন ভৎ'সন লোকনিন্দা সহ্য করিয়া ইহ পরলোক, শাস্ত্রধর্ম্ম, স্বজন পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রেমরসোল্লাসের এই হৃদয়োন্মাদকর সুতীব্র মাধুর্য্যই পরকীয়া প্রেমের লক্ষ্য; এই জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপে রূপকচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহার বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যখন আমরা বিষয়মোহে হতচেতন হইয়া সংসারকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করি, তখনই আমরা সংসারকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকি। এই সংসারাসক্তিরূপ পতির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন করাই গোপীভাব। গোপীদিগের প্রেম ইন্দ্রিয়-বিকার-জনিত কাম নহে, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম; ভাবসাম্য বশতঃ প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ সকল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"
(হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধুধৃত গৌতমী তন্ত্র বচন।)

গোপরামাদিগের প্রেম "কাম" এই নামেতে আখ্যাত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা বিশুদ্ধ প্রেম। উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণ তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত প্রীতি-বাঞ্ছাই প্রেম, আর অযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে কাম বলা যায়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ

পরমাত্মাই জীবাত্মার যথাযোগ্য প্রীতির বিষয়, ভগবৎসম্বন্ধ-শূন্য পার্থিব বিষয়ই প্রীতির অযোগ্য বিষয়। লৌহ ও স্বর্ণ উভয়ে ধাতু হইলেও যেমন স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে, কাম ও প্রেমেও তদ্রূপ। কাম অন্ধতমঃ স্বরূপ, প্রেম নির্ম্মল প্রদীপ্ত সূর্য্য। যাহা আত্মপ্রীতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম, আর যাহা সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়বিলাস বিস্মৃত করাইয়া তনুমনইন্দ্রিয়কে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা ও প্রীতি-সাধনে নিযুক্ত করে তাহাই প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,

"গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখলাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

নিরুপাধি নির্ম্মল প্রেমের রীতি ও অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব এই যে, যদিও গোপীর সুখ-সম্ভোগে বাসনা নাই, কিন্তু প্রাণনাথের চরণে হৃদয় মন অর্পণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন হইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্ভব হয়। এই জন্যই গোপীর প্রেম কামগন্ধ শূন্য, যেহেতু ইহা গোপীর স্বার্থপর সুখ নহে—কৃষ্ণ-পর সুখ।

"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥"

চৈঃ চঃ আদিখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

প্রীতির বিষয় অর্থাৎ প্রীতিপাত্র কৃষ্ণের আনন্দেই প্রীতির আশ্রয়স্বরূপা গোপীগণের আনন্দ হইয়া থাকে। প্রেমাস্পদের সুখেই প্রেমিকের সুখ, ইহাই প্রীতির ধর্ম্ম। সুতরাং গোপিকারা যে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করেন, তাহা নিষ্কাম অহৈতুকী প্রীতির পুরস্কার মাত্র। গোপী-প্রেমের স্বার্থশূন্য বিশুদ্ধতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পুনশ্চ কথিত হইতেছে, এই প্রেমানন্দে অতিমাত্র বিহ্বল হইলে যদি ভগবানের সেবার ব্যাঘাৎ হয়, অর্থাৎ আনন্দ সম্ভোগেচ্ছার প্রাচুর্য্যবশতঃ

কর্ত্তব্য সাধনে অন্তরায় ঘটে, তাহা হইলে সেই প্রেমানন্দকেও গোপীগণ ('অর্থাৎ ভক্তগণ) দূরে পরিত্যাগ করেন।

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
কম গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"

চৈঃ চঃ আদিখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং গোপী প্রেমে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সাধনাতে কামনার গন্ধমাত্রও নাই। এই কারণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে এই নির্ম্মল অনুরাগমার্গ অবলম্বন বতীত বিশুদ্ধ অকিঞ্চনা ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। প্রধানা গোপিকা শ্রীরাধিকাতে এই মাধুর্য্যগুণোপেত মহাভাবময়ী ভক্তির চরম অভিব্যক্তি। ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই গ্রন্থই ব্রজবিহার বর্ণনার আদি গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই ভাগবতে রাধিকার নাম নাই †। ভাগবতের রাসপঞ্চা-

* ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কথিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক, শ্রীকৃষ্ণকে চামর-ব্যজন করিবার সময়ে প্রেমানন্দে তাঁহার দেহ অবশ প্রায় হইলে, সেবার বাধা জন্মাইবে বিবেচনায় সেই আনন্দকে তিনি অভিনন্দন করিলেন না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

† বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশেও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিহার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহতেও রাধিকার নাম নাই। মহাভারতেও কেবল সভাপর্ব্বে দ্রৌপ

ধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া জনৈক গোপীসহ একাকী রজনীযোগে বনান্তরালে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, এই গোপী সম্বন্ধে অন্যান্য গোপী-বালাগণ বলিতেছেন,

"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

অর্থাৎ হে সহচরি! এই রমণী আরাধনা দ্বারা ভগবান ঈশ্বর হরিকে নিশ্চয় বশীভূত করিয়াছে। তাহা না হইলে গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে লইয়া প্রীত মনে নিভৃতস্থলে যাইতেন না। এই শ্লোকের "রাধিত" শব্দ হইতেই উত্তরকালে "রাধা" নামকরণ হইয়াছে। 'রাধ' ধাতুর অর্থ সাধন, প্রাপ্তি, সন্তোষণ, পূজা। যে আরাধনা করে, সেই রাধা। "রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণম্।" (বৈষ্ণবতোষণী) চক্রবর্ত্তী বলেন, "রাধয়তি কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূরণং আরাধয়তীতি রাধা।"

রাধিকা যে প্রাকৃত গোপবধূ নহেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পরমেশ্বরের পরা-প্রকৃতি অর্থাৎ

দীকৃত কৃষ্ণস্তবের মধ্যে "গোপীজনপ্রিয়" এই শব্দমাত্র আছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত-পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে রাধিকার নাম নাই। কিন্তু অনেকের মতে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের লিখিত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অতিশয় অনুচিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ব বেদান্তর্গত "গোপালতাপনীয়োপনিষৎ" বৈষ্ণবগণের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ, ইহাতে একজন প্রধানা গোপিকার নাম আছে, কিন্তু তিনি রাধিকা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্ব্বা

স্বরূপশক্তির নামই রাধা। রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণশক্তিমান, মৃগমদ ও তদ্গন্ধ, এবং অগ্নি ও জ্বালা যেমন যুগপৎ ভেদ ও অভেদতত্ত্ব প্রকাশ করে, রাধাকৃষ্ণ তদ্রূপ। রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিঃহ্লাদিনী নাম শক্তিঃ" শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। সৎ-চিৎ-আনন্দ ঈশ্বরের শক্তি। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ইহা সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হইয়াছে *। এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা ভগবান স্বয়ং আনন্দাস্বাদন করেন, ও ভক্তচিত্তে আনন্দ বিধান করেন। সমুদায় জীবেই এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। ভগবানের এই হ্লাদিনী বা আনন্দবিধায়িনী শক্তির বিকাশে প্রেম বা আনন্দ-চিন্ময়রসের অভ্যুদয় হয়। প্রেমের সার ভাব, ভাবের ঘনীভূত বা পরাকাষ্ঠা অবস্থা মহাভাব, এই মহাভাব সমুদায় চিন্তার সার চিন্তা, এই জন্য ইহাকে চিন্তামণি বলা যায়; ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ-বিগ্রহ। রাধিকার প্রাকৃতিক দেহ নাই, ললিতাদি সখীনিচয় তাঁহার কায়ব্যূহরূপিণী। † রাধিকার আধ্যাত্মিক রূপ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

* "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে॥" বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ।

† "সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
অনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

১৫ এই প্রেমাধার মহাভাবরূপা রাধিকার প্রতি ভগবানের স্নেহই সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায়, তাহার সুঘ্রাণ অর্থাৎ উদ্বর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহ রাধিকার অঙ্গের উজ্জ্বলবর্ণ। এই কৃষ্ণপ্রেমরূপ সুগন্ধযুক্ত উজ্জ্বল দেহ পরমেশ্বরের কৃপারূপ অমৃতধারায় স্নাত হইয়াছে। তারুণ্যামৃত বা চিরনবীনত্ব ও লাবণ্যামৃত বা সর্ব্বসৌন্দর্য্যরূপ অমৃতরসে তাহা পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত হইতেছে। লজ্জারূপপট্টবস্ত্র ও কৃষ্ণানুরাগরূপ অরুণবসনে রাধা দেহ শোভা পাইতেছে।* প্রণয়ের অভিমান তাঁহার বক্ষআচ্ছাদনী কঞ্চুলিকা। সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম, প্রণয়রূপচন্দন ও স্মিতকান্তিকর্পূরে শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত ও হরিপ্রেমরসমৃগমদে তাহা চর্চ্চিত। প্রচ্ছন্নমান তাঁহার বেণীবিন্যাস। অনুরাগ অধরের তাম্বূলরাগ, প্রেমকৌটিল্য নয়নযুগলের কজ্জল। হর্ষ পুলকাদি সঞ্চারী ও সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব এবং রসশাস্ত্রান্তর্গত নায়ক সমীপে নায়িকার কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। এই ভাবভূষণে ভূষিতা, গুণশ্রেণিরূপপুষ্পমালা ও সৌভাগ্যরূপ-তিলকধারিণী মহাভাবরূপা রাধিকাদেবী হরিলীলার অনুকূল মনোবৃত্তিরূপাসখীগণ

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ।*
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

পরিবেষ্টিতা হইয়া নিজ অঙ্গের সৌরভপর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদা হরিসঙ্গলাভ চিন্তাতে মগ্ন আছেন। ভগবানের যশঃ-মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনেই তিনি নিরন্তর নিমগ্না। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরত্নাকর হৃদয়েশ্বরকে প্রেমরূপসোমরস পান করাইয়া তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করেন *। এবম্ভূত শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত কি প্রকার? উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে রূপ গোস্বামী বলিতেছেন,

"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ত জতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্যক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভি র্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী ॥"

হে গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ! কন্দর্প শিল্পকার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্য মধ্যে তোমার এবং শ্রীরাধিকার চিত্তজতু দুইটী উভয়ের নবপ্রেমানুরাগরূপ হিঙ্গুলবর্ণে বারম্বার বিলেপন করতঃ প্রেমাগ্নিস্বেদের দ্বারা ক্রমশঃ ভেদরূপ মিথ্যা জ্ঞানবিরহিত করিয়া অর্থাৎ অভিন্নরূপে সংমিশ্রিত করতঃ কেমন অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই শ্লোকে প্রেমভক্তি যোগের অতি নিগূঢ় ভাব সূচিত হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগতভেদ নিত্য, কিন্তু জীব যখন প্রবল ব্যাকুলতাতে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যসাগরে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলে, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং আপনার অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়া তন্ময় হইয়া

* চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

রায়। এই অবস্থায় সে সমুদয়ই ব্রহ্মময় দর্শন করে। উপরোক্ত শ্লোকে প্রেমে বিগলিত দুইটী চিত্তের অভেদভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ভক্তহৃদয় গভীর প্রেমানন্দে উচ্ছ্বসিত হইলে বিবিধ ভাববৈচিত্র্যের উদ্গম হয়, এই জন্য নবরাগহিঙ্গুলে অতি সুন্দর রূপে অনুরঞ্জিত হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ একটী আধ্যাত্মিক রূপক। রাধা সাধক, কৃষ্ণ উপাস্য, এইটীই রাধাকৃষ্ণের মূল ভাব। চিত্তরূপ বৃন্দাবনে হৃদয় রাধিকা দয়া শ্রদ্ধা বুদ্ধি প্রেম অনুরাগাদি মনোবৃত্তিরূপ সখীনিচয়-পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের প্রেমানন্দ সম্ভোগ করেন, ইহাই এই আধ্যাত্মিক রূপকের মর্ম্ম।

রায় রামানন্দের সহিত চৈতন্য দেবের যখন সাধনতত্ত্ব বিষয়ে কথোপকথন হয়, তখন তিনি রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাধ্য-বস্তু সমুদায় ত জানিলাম, সাধন বিনা ইহা লাভ হয় না; লাভ করিবার উপায় বলিয়া দাও। রামানন্দ বলিলেন, সখীভাবই সাধনার সার। সখীভাব ভিন্ন আর কোন উপায়েই ইহা লাভ হয় না। সখীভাব "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, সখীগণের প্রেম নিঃস্বার্থ, সখীগণ রাধিকাকে কৃষ্ণসঙ্গ করাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অর্থাৎ মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ প্রেমাধার হৃদয়কে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাস করিতে দিয়া আপনারা পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপুষ্ট হয়। ঈশ্বরপ্রেম কল্পলতা সদৃশ, দয়া শ্রদ্ধা অনুরাগাদি মনোবৃত্তি সকল পল্লবপুষ্পপত্র স্বরূপ। লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে যেমন পুষ্পপত্র প্রফুল্লিত হয়, সেই প্রকার

প্রাণ যখন বিশুদ্ধ প্রেমযোগে প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরে মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি মানসিক-বৃত্তি সকল আধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই প্রকারে নিস্পৃহ স্বার্থশূন্য হইয়া স্বাভাবিক অনুরাগভরে যে পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহার চিত্তবৃত্তি সকল ধর্ম্মের অনুকূল হয়, সমুদায় ইন্দ্রিয় মধুময় ও পবিত্র হইয়া যায়। পবিত্র স্বরূপ ভগবানের সংস্পর্শে মনোবৃত্তি সকল পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমে পরমাত্মাতে রমণ করে। ইহাই সখীভাবের তাৎপর্য্য। ইহা অবিশুদ্ধ ঐন্দ্রিয়ক ভাব নহে।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥"

ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ সমুপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে কি প্রকার অনুভাবের উদয় হয়, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করাই ভাগবতাদি শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য। এই কারণে ভক্তিরসের পরিপুষ্টিসাধন জন্য গোপগোপীসংস্পৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রাকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ আর্য্য শাস্ত্রের সুবহু স্থলই এইরূপ অর্থবাদ ও আলঙ্কারিক বাক্যে পরিপূর্ণ। মূল কথা এই যে, উজ্জ্বল প্রেমাবলম্বনে ভগবানের আরাধনাতে লোক সকলকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কৃষ্ণের ব্রজলীলার অবতারণা। ভাগবতের রাসলীলা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। এই লীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত বারংবার সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার

ঈদৃশ নিন্দনীয় আচরণের কারণ কি? শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দ্বারা নানারূপে পরীক্ষিতের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান বিষ্ণুর এই ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি ত্বরায় ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া ধীরচিত্তে হৃদয়ের রোগরূপকাম শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন। * শুকদেবের এই বাক্যে ভাগবতকারের যথার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতকার একাধারে মহাদার্শনিক ও মহাকবি। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে স্বীয় গ্রন্থে রাসক্রীড়াদির বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পুরাণ ও কাব্যাদিতে ভাগবতকারের ন্যায় দেবচরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রমাণ স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের নাম করা যাইতে পারে। অনাবশ্যক বোধে ও অশ্লীলতা দোষ পরিহারের জন্য ইহার আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকমুখে গোপীদিগের যে মাধুর্য্যরসাশ্রিত ব্রজবিহারের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, পরে তাহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

ভাগবত, দশম স্কন্ধ।

তৎপরে ক্রমে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনে কাষ্ঠাভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্য যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভাগবত-উক্ত মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধে তাঁহার অতি কঠিন শাসন ছিল। তিনি পরমজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। ভাগবতের লীলা সকল তিনি যে প্রাকৃত ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহা কথনই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ রামানন্দের সহিত তাঁহার সাধ্য-সাধন-প্রসঙ্গ পাঠ করিলে স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে তিনি ব্রজলীলা আধ্যাত্মিক-তত্ত্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবত-প্রোক্ত প্রেমের অত্যারূঢ় ভাব সকল চৈতন্যের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া তদীয় শিষ্যগণ তাঁহাকে একদেহে যুগপৎ রাধাকৃষ্ণের দৃশ্যমান অবতার বলিয়া গিয়াছেন। * ফলতঃ

* শ্রীমদ্রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যাবতার প্রাণপণে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যাবতার যে এতদ্দেশে এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ইঁহাদেরই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের ফলে বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবদিগের মতে স্বয়ং ভগবানের অবতারের মূল প্রয়োজন দুইটী, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। ভাগবতাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভূভারহরণাদি অর্থাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশসাধন, কৃষ্ণ অবতারের বহিরঙ্গ কারণ। আর ব্রজধামে নির্ম্মল প্রেমলীলা প্রচার করা অন্তরঙ্গ কারণ। সেইরূপ কলিযুগে শুষ্ককর্ম্মকাণ্ডরত হরিভক্তিবিহীন লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা চৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ। ইহা ব্যতীত অন্তরঙ্গ নিগূঢ় কারণ আছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী স্বপ্রণীত

আত্মাবরুদ্ধ মাধুর্য্যই যে মাধুর্য্যরসের শেষ পরিপাক, চৈতন্যের বিশুদ্ধ জীবনেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান

কর্তৃক তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, অর্থাৎ আমার প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরিমাণ কত? আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য রস যাহা কেবল রাধিকাই আস্বাদন করেন তাহাই বা কি প্রকার? এই মধুময় রসাস্বাদনে করিয়া তিনি যে আনন্দলাভ করেন, তাহাই বা কিরূপ? এই তিনটী তত্ত্ব অনুভব করিতে লোভ জন্মিলে রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ প্রেমলীলাতে পরমসুখ সম্ভোগ করিতেন কিন্তু তাঁহার অতুল মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া রাধিকা যাদৃশ আনন্দলাভ করিতেন, কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ ও পূর্ণপ্রেম-স্বরূপ হইলেও তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া, অতীব ক্ষুব্ধ ছিলেন। "না জানি রাধার প্রেম কত গভীর, যাহাতে আমিও বিহ্বল হইয়া যাই," এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। এইজন্য রাধার প্রকৃতিতে স্বীয় প্রেম রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকা ও পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে রাধাপ্রকৃতি ও রাধাকান্তিতে মণ্ডিত হইয়া এক দেহে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণে শ্রীচৈতন্য রাধিকার ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়াছিলেন, ও আপনাকে রাধা স্থানীয় ভাবনা করিয়া কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তবৎ প্রলাপ প্রকাশ করিতেন।

সময়ে গোস্বামী ও বৈষ্ণবনেতাদিগের দোষে সাধারণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা অতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রণয়রহস্য সাধারণ লোকে পাছে ভুল বুঝে, এই আশঙ্কায় জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি উজ্জ্বল রসের গ্রন্থ সকল সাধারণের মধ্যে আলোচনা ও প্রচার করা অন্যায় বিবেচনা করেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ বৈষ্ণবই মাধুর্য্য-রসের সাধক। নেড়া, সহজিয়া, আউলে প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে তাহারা এখন বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে এখন নানাপ্রকার ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার রাজত্ব করিতেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-ব্যাপার ও বৈষ্ণবদিগের সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিয়া কি আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব নিষ্কর্ষ করা যায়, আমরা তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে তত্ত্বপক্ষীয় এই সকল আধ্যাত্মিক ভাব কিছুমাত্র আদৃত হয় না। অধিকাংশ বৈষ্ণব ইহার মর্ম্ম গ্রহণেও সমর্থ নহে। প্রপঞ্চময় বৃন্দাবন-লীলাই এখন তাহাদের আদর্শস্থানীয়। সাধারণের মধ্যে এই উজ্জ্বল রস প্রচার করাতে অনেক পরিমাণে যে এদেশের নৈতিক অবনতি সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।